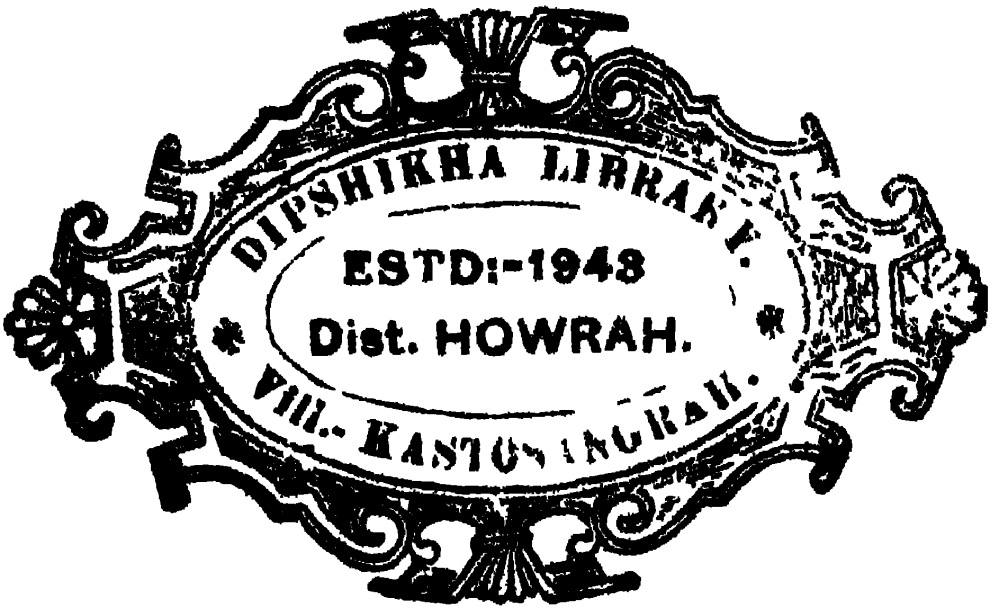
# পঞ্চাশের মন্বন্তর



'অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, "আমরা সোনারূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়,—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।" একজন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল, "চাল দাও, চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোনারূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল সে সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই একজনকে মারিল। তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ ও ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।"...এই বলিয়া সেই বিশীর্ণ দেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তিসকল অন্ধকারে খলখল হাস্য করিয়া করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।' —আনন্দমঠ

# পঞ্চাশের মন্বন্তর

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ভয়াবহ স্মৃতি বাঙালি ভুলিতে পারে নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তরও বাংলার ইতিহাস চিরদিন মসীচিহ্নিত করিয়া রাখিবে।

১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লইলেন। দেশে তখন যে অবস্থা চলিতেছিল, তাহা অরাজকতারই নামান্তর। নানা কর্তা—অসংখ্য শাসন-বিধি। শোষণ পুরাদস্তর তো চলিতেই ছিল, তাহার উপর অনাবৃষ্টি ও অল্পবৃষ্টির দরুন অজন্মা ও শস্যহানি ঘটিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল মন্বন্তর (১৭৭০ অব্দ)। দেশ শ্মশান হইয়া গেল। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের কতকটা কৈফিয়ৎ চলিতে পারে,—ইংরেজ যে শাসন-মহিমার জগৎময় ঢক্কা পিটাইয়া থাকে, মাত্র পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে উহা তখনও দৃঢ়মূল হইবার অবকাশ পায় নাই।

কিন্তু ১৯৪৩ অব্দে এরূপ কোন কৈফিয়ৎ চলিতে পারে না। পৌনে দুই শত বৎসরের অধিককাল দোর্দণ্ড প্রতাপে শ্বেত-রাজত্ব চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দী অজস্র সুযোগ-সুবিধা মানুষের হাতে আনিয়া দিয়াছে; বিজ্ঞান-দাক্ষিণ্যে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে। এখনও দুধের অভাবে কত ছেলে মায়ের কোলে মরিয়া গেল, ডাস্টবিনে মানুষ পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া উচ্ছিষ্ট খাইল, এ দৃশ্য মাসের পর মাস আমরা চোখে দেখিয়াছি।

বাংলার অসামরিক সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের বারোটি কারণ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

(১) ১৯৪২ অব্দে আউশ ফসল ভাল হয় নাই।

(২) ১৯৪২-৪৩ অব্দে আমন ধানও কম ফলিয়াছে।

(৩) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলা বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উৎপাদন কম হইয়াছে।

(৪) কীটের উপদ্রবে ফসল নষ্ট হইয়াছে।

(৫) সরকারের নৌকা-নিয়ন্ত্রণ নীতি চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

(৬) সমুদ্রকূল হইতে লোক-অপসারণের ফলে উৎপাদনের ক্ষতি হইয়াছে।

(৭) ব্রহ্ম ও আরাকান হইতে আগত আশ্রয়ার্থীরা ভিড় জমাইয়াছে।

(৮) শিল্পকেন্দ্রগুলিতে ভিন্ন প্রদেশের মজুর অনেক বাড়িয়াছে।

(৯) ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানি বন্ধ হওয়ায় ঘাটতি-পূরণের উপায় হয় নাই।

(১০) অনেক বিমানঘাটি তৈয়ারি হওয়ায় সেই সব জায়গায় চাষ হইতে পারে নাই।

(১১) সামরিক লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় খাবার বেশি খরচ হইয়াছে।

(১২) অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানি কম হইয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর (১৯৪৩) পার্লামেণ্টে ভারত সম্বন্ধে এক বিতর্ক হইয়াছিল, তাহাতে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। সরবরাহ-সচিবের বারো দফার মধ্যে ইহার উল্লেখ মাত্র নাই। স্পষ্টত তিনি গৌণ কারণগুলির উপর জোর দিয়া আসল ব্যাপার চাপিয়া গিয়াছেন। সরকার-পক্ষ যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁহাদের কেনা জিনিষের দাম দিতে গিয়া প্রচুর কাগজি-নোট বাজারে ছাড়িয়াছেন। যাহারা সরকারি কাজ করে, যুদ্ধের মালপত্র জোগান দেয়, কলকারখানায় নানাবিধ যুদ্ধদ্রব্য উৎপাদন করে, তাহারা সেই কাগজি-নোট অজস্র পরিমাণে পাইল; তাহা দিয়া মহাস্ফূর্তিতে জিনিষপত্র

কিনিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ লোকই ইহার অনেক পূর্বে অপেক্ষাকৃত ভাল দাম পাইয়া মাল বেচিয়া দিয়াছে; ফাঁপানো-মুদ্রার অংশ তাহাদের হাতে পড়িল না। জিনিষপত্র তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়াইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিতে লাগিল। ফাঁপানো-মুদ্রানীতির জন্য ভারত-সরকার তথা ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র দায়ী। এই বিষয়ে খুলিয়া বলিলে সাহস ও সত্যভাষণের জন্য সরবরাহ-সচিবকে প্রশংসা করা যাইত।

পার্লামেণ্টের বিতর্ক-সভায় মিঃ পেথিক লরেন্স কয়েকটি খাঁটি কথা বলিয়াছিলেন। 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তাহা কিনিবার ক্ষমতা অসংখ্য লোকের নাই। মুদ্রাস্ফীতিই এই অত্যধিক মূল্য-বৃদ্ধির কারণ। ইহার জন্য আর কেহ নয়—একমাত্র ভারত-গবর্নমেণ্টই দায়ী।' মিঃ আমেরিও আমতা-আমতা করিয়া ইহাতে একরকম সায় দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সমস্যাটি হইতেছে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা। জনসাধারণের হাতে কিনিবার মতো টাকা ছিল না, ইহা ঠিক। তাহা হইলে অবস্থাটা আজিকার মতো এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত না।'

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। টাকা থাকিলেই হয় না। অনেকে দিন আনিত, দিন খাইত; জিনিষের ক্রম-বর্ধমান দামের সহিত তাহাদের সঙ্গতি তাল রাখিতে পারিল না। নিঃস্ব নিরন্ন হইয়া এমন অবস্থার লোক প্রভূত পরিমাণে মরিয়াছে। অথচ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা কিছুই হয় নাই; অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গেলে তবে কর্তাদের কিছু টনক নড়িয়াছে।

সরবরাহ-সচিবের হিসাবে অপচয়ের কথাটাও নাই। কৃষক, মধ্যবিত্ত-ক্রেতা, দোকানদার প্রভৃতির বিরুদ্ধে এ যাবত খুব আস্ফালন চলিয়াছে;

মিঃ আমেরির দল বলিয়াছেন, মাল মজুত করিয়া রাখিয়া ইহারাই দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়াছে। আসল গলদ যেখানে, সেদিক হইতে এই প্রকারে সকলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। বাজারের সব চেয়ে বড় ক্রেতা সরকার; সব চেয়ে বড় মজুতদারও সরকার এবং সরকারের সাহায্যকারী কলকারখানার মালিক ও ধনিক-সম্প্রদায়। মজুত খাদ্যের মধ্যে কত যে অপচয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কে দিবে? ব্রহ্ম-সীমান্তের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অপরিমেয় আহার্য নষ্ট হইয়াছে। ভারত-সরকারের সঞ্চিত আটা ময়দা ছোলা ছাতু প্রভৃতির কি পরিমাণ অপচয় হইয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব পাইলে বর্তমান দুর্ভিক্ষের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। কলিকাতায় এ. আর. পি. র আনুকূল্যে শত্রু-বিড়ম্বিতদের জন্য যে সামান্য পরিমাণ জিনিষ মজুত করা হইয়াছিল—তাহাতেও প্রচুর অপচয় ঘটিয়াছিল, এ তথ্য সকলের জানা আছে।

দুর্ভিক্ষ একদিনে আসে নাই। সরবরাহ-সচিবের উল্লিখিত বারো দফার কারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, করাল মন্বন্তর ধীরে ধীরে বাংলাকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার প্রতিকার-চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার শোচনীয় ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। দেশ-বিদেশের সৈন্য দলে দলে আসিয়া বাংলাদেশ ভরিয়া ফেলিল, সহস্র সহস্র শত্রুকে বন্দী করিয়া আনা হইল—তাঁহাদের অনেকের বোঝা বাংলার কাঁধে চাপিল, ব্রহ্ম হইতে অসংখ্য আশ্রয়ার্থী আসিয়া জুটিল, কলকারখানায় ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংখ্যাতীত মজুর আসিল। কেন্দ্রীয় সরকার তখনও মনে করিতেছেন বাংলাদেশ অবাধে সকলের অন্ন যোগাইয়া যাইবে, কোন প্রকার অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

সৈন্যদের খাদ্য সাধারণ বরাদ্দ হইতে অনেক বেশি। শুধু চাউল নয়—ফলমূল তরি-তরকারি মাছ-ডিম-মাংস প্রভৃতিও তাহাদের জন্য

প্রচুর পরিমাণে ক্রীত হয়। ঐ সব জিনিষ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় চাউলের উপর টান বাড়িয়া গেল। ইহার উপর সরকার আবার সৈন্য-দলের জন্য দশ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সর্বদাই মজুত রাখিতে লাগিলেন। বড় বড় কারখানার মালিকরা যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচুর লাভবান হইয়া মজুর ও কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্যতের খাদ্য-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। সরকার পরোক্ষে ইহাদের সহায়তা করিলেন। জনসাধারণের কথা কেহ ভাবিল না।

শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় কয়েকটি জেলা হইতে ধান সরানো হইল। ধান সরাইলেই তো স্থানীয় লোকের পেটের ক্ষুধা ঐ সঙ্গে লোপ পায় না! খাদ্যবস্তুর সন্ধানে তাহারা ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। চাউলের দর হঠাৎ খুব বাড়িয়া গেল। ইহার উপর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়া জনসাধারণকে আরও ভীতিগ্রস্ত করা হইল। এরূপ ক্ষেত্রে লোকের মনে ভরসা জাগাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করা উচিত। সরকার তাড়াহুড়া করিয়া এমন সব কাণ্ড করিতে লাগিলেন যে সাধারণে সরকারের উপর ক্রমশ আস্থা হারাইয়া ফেলিল। মন্বন্তর দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ছবি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বর্ণনায় সাহিত্যিক-সুলভ অতিশয়োক্তি কিছুমাত্র নাই। ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে একটি দুর্ভিক্ষ-কমিশন বসে। কমিশন যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আনন্দমঠের বর্ণনা তাহার কোন কোন অংশের হুবহু বাংলা অনুবাদ। আনন্দমঠের চিত্রের সঙ্গে আজিকার দুরবস্থা মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের পরেও দুর্ভিক্ষ অনেকবার হইয়াছে *। ইহার

---

* যথা :—১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৭৫-৭৬, ১৮৮৪-৮৫, ১৮৯১-৯২, ১৮৯৭ ১৯০০ ইত্যাদি।

মধ্যে ১৮৭৩-৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে দুই কোটি লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দ্রুততার সহিত যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়; তাই সেবার লোকক্ষয় সামান্যই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-দমনে এই একবার মাত্র সরকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ৭৩-৭৪ অব্দের ব্যবস্থা এবারে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। বরঞ্চ ১৭৭০, ১৭৮৩ ও ১৮৬৬ অব্দে যে অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার ফলে অবস্থা ভয়াবহ হইয়াছিল, পঞ্চাশের মন্বন্তরে অবিকল তাহাই দেখা যাইতেছে। আজিকার মতো তখন অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণের আতঙ্ক ছিল না, কিন্তু এই একটি বিষয় ছাড়া সকল পারিপার্শ্বিকতা আশ্চর্যরূপ মিলিয়া যায়।

১৭৭০ খৃস্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল, কর্তৃপক্ষ অমনি 'সৈন্যমণ্ডলীর ছয়মাসের খোরাকি কিনিয়া গুদামজাত করিবার মতলব করিলেন।' অক্টোবর মাস হইতে দেশে হাহাকার উঠিল; নবেম্বর মাসে 'যাহার দুই এক কাহন হইয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন।' এই নবেম্বর মাসেই 'কালেক্টর-জেনারেল আশঙ্কা করিলেন, দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে।'

১৯৪৩ অব্দের অবস্থা অনুরূপ নয় কি? সরকারি ভাষাই উদ্ধৃত করিতেছি—'দেশরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনে সৈন্য-বিভাগের তরফ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-ক্রয় হইল। তাহা ছাড়া 'জরুরি অবস্থার প্রতিষেধ হিসাবেও খাদ্য-ক্রয় করিতে হইয়াছে।'

তখনকার দিনে এই চাউল-মজুতের ব্যাপারে এলাহাবাদ ও ফৈজাবাদের বৃটিশ অফিসারের নিকট কোম্পানি চাউল কিনিতে পারেন নাই। এবারেও দেখা গিয়াছে, অন্য প্রদেশ হইতে—বিশেষত লাট-শাসিত প্রদেশগুলি হইতে চাউল কিনিতে গিয়া বাংলা-সরকার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের আমলে সন্দেহ করা হইয়াছে, 'ব্যক্তিগত লাভের কারবার খুব চলিয়াছিল।' কোম্পানির কর্মচারিরা এমন অবস্থা করিয়া তুলিল যে বাজারে চাউল পাইবার উপায় রহিল না। দেশে হাহাকার উঠিল; প্রতিবাদ উঠিতে লাগিল। এমন কি কোম্পানির ডিরেক্টররাও কর্মচারীদের অপকর্ম ও অর্থগৃধ্নুতার অজস্র নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই।

১৯৪৩ অব্দেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। চারিদিকে প্রচুর কলরব উঠিলে মাত্র ১৫ই সেপ্টেম্বর সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিলেন, অন্য প্রদেশের চাউল বাংলায় কেঁচিয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হইয়াছে বটে, তবে সেটা গোড়ার দিকটায়। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখনকার দিনেও অধিক পরিমাণে মাল কেনা ও মজুত করার বিরুদ্ধে হুকুম জারি হইয়াছিল। অন্নাভাবে মানুষ মরিতেছে, তবু অবাধ-রপ্তানি চলিতেছিল। জর্জ টমসনের মতে, 'দুর্ভিক্ষের সময়ে রপ্তানিটা যদি বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে চাউলে কুলাইয়া যাইত—অনাহারে মানুষ মরিত না।' এই রপ্তানি কবে শুরু হইয়াছিল জানা যায় নাই; ১৪ই নবেম্বর (১৭৭০) অনেক চেষ্টার পর রপ্তানি বন্ধ করা হয়, ইতিহাসে এই বিবরণ রহিয়াছে।

এবারেও রপ্তানির বিরুদ্ধে অনেক চেঁচামেচি হইয়াছিল; কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অনেক বিলম্বে ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে রপ্তানি কতক পরিমাণে বন্ধ হইল, একেবারে বন্ধ হয় নাই। এখনও কয়েকটি ব্যাপারে বিদেশে চাউল রপ্তানি হইতে পারিবে, তবে সরকারি হিসাবে উহা মাসিক এক হাজার টনের অধিক হইবে না। সরবরাহ-সচিব পঞ্চাশের মন্বন্তরের যেসব কারণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই রপ্তানি-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ নাই।

বাংলাদেশ ১৭৭০ অব্দের ধাক্কা সহজে সামলাইতে পারে নাই; অভাব লাগিয়াই ছিল। ১৭৮৩ অব্দে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এইবার কর্তৃপক্ষ একটু সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন, জলপথে রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। একটি কমিটি তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর দণ্ডমুণ্ডের চরম ক্ষমতা দেওয়া হইল। নির্দেশ দেওয়া হইল, যদি কোন ব্যবসাদার খাদ্যশস্য গোপনে মজুত করিয়া রাখে, বাজারে আনিয়া ন্যায্য মূল্যে বেচিতে অস্বীকার করে—তবে তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া তো হইবেই, অধিকন্তু তাহার মাল বাজেয়াপ্ত করিয়া গরিবদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হইবে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরেও এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ফল কি হইয়াছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়া তাহা দেখাইয়া গেল। সরকারি আদেশ অবাধে এবং প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই অবহেলিত হইয়াছে। সরকারও আদেশের পর আদেশ সংশোধন করিয়া চলিয়াছিলেন।

১৭৮৩ অব্দের দুর্ভিক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইয়াছিল, বাংলা ও বিহার এই দুই প্রদেশের জন্য একটি কায়েমি শস্যাগার তৈয়ারি করিতে হইবে। তদনুযায়ী পাটনায় পাকা-গাঁথনির এক প্রকাণ্ড গোলাঘর নির্মিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখা আছে—For the perpetual prevention of famines in India. কিন্তু গোলাঘর চিরদিনই শূন্য রহিয়া গেল, কোনদিন একমুঠা ধান তাহার মধ্যে পড়ে নাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়েও ফুড গ্রেইনস্ কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন, একটা কেন্দ্রীয় শস্যাগার তৈয়ারি করিতে। এই শস্যাগারের জন্য পাকা ইমারত তৈয়ারি হইবে কিনা, এবং শেষ পর্যন্ত ইহাতে কি পরিমাণ শস্য উঠিবে, তাহা দেখিবার বিষয়।

১৮৬৬ অব্দে যে মন্বন্তর ঘটে, উহাকে সাধারণত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ বলা হয়। 'সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের সমুদ্রে' সমগ্র উড়িষ্যা পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ জেলায় উহার ঢেউ আসিয়াছিল। এই মন্বন্তরের কবলে উড়িষ্যার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, আজ বাংলার অবস্থাও অবিকল সেইরূপ। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন অগণিত অন্নহীন মারা পড়িতেছে, শিয়াল-কুকুরে মানুষের শব ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে। সরবরাহ-সচিব অবশ্য বলিতে চাহিয়াছেন, বাংলার সমস্ত অঞ্চল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয় নাই। কিন্তু ধাপ্পা দিয়া সত্যকে চাপা দেওয়া যায় নাই। ১৮৬৬ অব্দের মন্বন্তরে প্রায় দশ লক্ষ লোক মরিয়াছিল। যদি কোনদিন ১৯৪৩ অব্দের নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ বাহির হয়, দেখা যাইবে সেবারের লোকক্ষয় পূর্ববর্তী সকল মন্বন্তরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে বিভিন্ন জেলার কালেক্টররা আংশিক অজন্মা লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে চাহিলেন। কিছু খাজনা মকুব করিবারও কথা হইল। কিন্তু কমিশনারেরা উহা সমর্থন করিলেন না। রেভেনিউ-বোর্ডও এইরূপ প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করিয়া দিলেন। বোর্ড এক বিস্তৃত বিবরণীতে বাংলা-সরকারকে জানাইলেন, ফসল কিছু কম হইতে পারে বটে—কিন্তু তাহাতে ভাবনার কিছু নাই; এই ফসলেই লোকের খাবার কুলাইয়া যাইবে। আগামী বৎসরের জন্য মজুত অবশ্য কম থাকিবে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

১৯৪৩ অব্দেও সেই অবস্থা। ব্রহ্মদেশ বেহাত হইয়া যাইবার পর কথা উঠিল, বৎসরের শেষের দিকে বাংলায় অন্নাভাব ঘটিতে পারে। কথাটা তুলিলেন, ভারত-সরকারের খুব মোটা মাহিনার এক কর্মচারী। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। ৩০শে এপ্রিল (১৯৪৩) তারিখের কাগজে বাহির হইল,

একটা লোকের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া পেটের মধ্যে ঘাস পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় হতভাগ্য ঘাস খাইয়াছে, হজম করিতে পারে নাই। কিন্তু উহারই এক সপ্তাহ পরে (৭ই মে) সরবরাহ-সচিব বলিলেন, 'সঙ্কটের সমাধান অদূরবর্তী'। পরদিন ৮ই মে বলিলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে বাংলায় যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে'। তখনকার খাদ্য-বিভাগের বড়কর্তা মেজর জেনারল উড ১৩ই মে বিস্তর অঙ্ক করিয়া দেখাইলেন, বাংলায় কোন অভাব নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব মাননীয় আজিজুল হক ১৫ই মে কৃষ্ণনগরে বলিলেন, 'বাংলায় এখনও চাউলের কমতি হয় নাই'। ৩০শে তারিখেও 'বাংলায় অপ্রচুর খাদ্য রহিয়াছে অথবা আমদানি অপ্রচুর হইতেছে'—একথা সুরাবর্দি সাহেব বলিতে পারেন নাই।

১৮৬৬ অব্দে তখনকার লাট স্যর সিসিল বীডনের গবর্নমেণ্ট বলিয়াছিলেন, দেশে প্রকৃত অন্নাভাব হয় নাই; ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য রহিয়াছে, অতিরিক্ত মুনাফার আশায় তাহারা মজুত করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলা-সরকারও বলিলেন, 'বাংলায় যে পরিমাণ খাদ্য রহিয়াছে তদনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি অসঙ্গত হইয়াছে। মজুত মাল বাজারে বাহির করিতে পারিলেই সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে।'

১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসেই চাউল-আমদানির দাবি উঠিয়াছিল। তখন বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া লোকে ইতস্তত ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, স্থানে স্থানে খাদ্য লুঠ হইতেছে। কিন্তু সরকার প্রত্যাসন্ন সঙ্কট উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ২৮শে মার্চ স্যর আর্থার কটন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরকারকে অবহিত হইতে বলিলেন। এপ্রিল মাসে কলিকাতায় চাঁদা তুলিয়া লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু রেভেনিউ-বোর্ডের তখনও সন্দেহ, সত্যই খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে কিনা। ক্রমে চাউল একেবারে অমিল হইয়া গেল। সৈন্য,সরকারি চাকুরিয়া এবং কয়েদিদের জন্যও চাউল

মিলে না। তখন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্নর বাহির হইতে চাউল আমদানির হুকুম দিলেন। সরকারের অকর্মণ্যতায় এই দুর্ভিক্ষে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা যায়। এইজন্য দুর্ভিক্ষ-কমিশন রেভেনিউ-বোর্ডকে খুব দোষ দিল। ১৮৬৭ অব্দের ১১ই আগস্ট রেভেনিউ-বোর্ড অজস্র ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'সময় মতো কাজে হাত না দেওয়ায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্ত অপর্যাপ্ত হওয়ায় দুর্দৈব ঘটিয়াছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে আনাড়ি লোক ছিল, দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়াও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। কাজে নামিতে অনেক দেরি হইয়া যাওয়ায় এমন অবস্থা ঘটিল যে শেষে টাকা দিয়াও খাদ্য মিলে নাই।' রেভেনিউ বোর্ড স্বীকার করিলেন, মিঃ র‍্যাভেন শ'র টেলিগ্রাম পাইয়া তৎক্ষণাৎ যদি কাজে নামা হইত, তাহা হইলে অসংখ্য জীবন রক্ষা পাইত।

১৯৪৩ অব্দের দুর্ভিক্ষেও ঠিক এই অবস্থা। আনাড়ি লোকের উপর ভার দিয়া বিস্তর অঘটন ঘটিয়াছে। একজনে একটা কাজের ভার পাইলেন, সে বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই তাঁহাকে অন্য বিভাগে চালান করা হইল। বাংলা ও কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য-সংক্রান্ত কর্মচারীদের এত রদবদল করিয়াছেন যে দ্রুততায় উহার কাছে সিনেমা-ছবিও হার মানিয়া যায়। ১৯৩৯ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৪২ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য ছয়টি কনফারেন্স করিয়াছেন। ১৯৪২ অব্দের ডিসেম্বরে খাদ্য-বিভাগ সৃষ্ট হয়; ১৯৪২ অব্দের এপ্রিলে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিল হয়। ১৯৪৩ অব্দের এপ্রিলে রিজিওন্যাল ফুড-কমিশনার নিযুক্ত হন। গড়ে মাস দুয়েক অন্তর পর পর চারি জন ফুড-মেম্বার হইলেন। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার; বাংলায় যে কত রকম পট-পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা সকলেই আমরা চোখের উপর দেখিয়াছি।

সরকারি ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩ অব্দে ঠিক ১৮৬৬ অব্দের মতো অবস্থা অতি শোচনীয় হইল। টাকা ফেলিলেও চাউল মিলে নাই। চাঁদা তুলিয়া নানা প্রতিষ্ঠান লোক খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিল। সরকার মনে করিলেন, এই রকম হাজার কয়েক লোক খাওয়াইয়াই জনসাধারণ হাঙ্গামাটা চুকাইয়া দিবে, তাঁহাদের মাথা ঘামাইবার গরজ হইবে না। পেটের দায়ে মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে, শহর-মুখো ধাওয়া করিয়াছে, কর্তাদের সেদিকে নজর পড়িল না।

অথচ এই অবস্থাই সকলের চেয়ে মারাত্মক। গ্রামের মধ্যে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিলে লোকের ঘর-গৃহস্থালি খানিকটা বজায় থাকিত, তাহারা কিছু কিছু আয় করিতেও পারিত, যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাবলম্বী হইয়া আবার মাথা তুলিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকিত। দুর্ভিক্ষ গ্রামের মানুষকে তাড়াইয়া শহরে আনে। যে ছিল গৃহস্থ, আত্ম-সম্মান হারাইয়া সে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭৮ অব্দের দুর্ভিক্ষ-কমিশনে স্যর রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, 'খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যখন ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে, দুর্ভিক্ষে সেই অবস্থা সকলের চেয়ে ভয়াবহ। ইহার ফলে লোক নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রামে শৃঙ্খলার সহিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র হইবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে।'

১৮৬৬ অব্দেও লোকে ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছিল; ১৯৪৩ অব্দের মতোই সদর রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ পড়িয়া থাকিত। আগস্ট মাসে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেবার বিস্তর লোক মরিয়াছিল। দলে দলে অস্থিসার মানুষ লঙ্গরখানায় জমায়েত হইত। তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল না। সরকার লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের লোক আসিয়া শহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে।

এন একরকম জোর করিয়াই শহরের অন্নসত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ; দুঃস্থদের বাহিরে পাঠানো হইল। সত্তর বৎসর পরে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছি। সেবার কলিকাতা শহরে লোক জমিয়াছিল পনের ষোল হাজার। ১৯৪৩ অব্দে সরকারি অনুমান, একলক্ষ।

সেবারও রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। কটকের রিলিফ-ম্যানেজার মিঃ কার্কউডের মতে, এই প্রকার সাহায্য দানে গ্রহীতার নৈতিক অধোগতি হয়। এ কথা ঠিক যে, লোকে রান্না-করা খাদ্য গোপনে বিক্রি করিয়া উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু আর একটা দিক ভাবিবার আছে। বহু পরিবারেই এইরূপ সাহায্য লইতে ইজ্জতে বাধে, তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ অব্দেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সরকারি তরফ হইতে কি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল ?

১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই সরকার অবহিত হইয়াছিলেন, তাই সেবার বেশি লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। খাদ্যের সন্ধানে লোকে গ্রাম ছাড়িবার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পৌঁছায়, দেহের শক্তি অবশেষ হইবার আগে যাহাতে কাজ পায়, অতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রার্থী সাহায্যের যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য সকলের চেয়ে প্রামাণ্য। শহরের উপর অন্নসত্র খুলিলে এই প্রমাণের উপায় থাকে না ; অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ অধিকাংশ দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পৌঁছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এইরকম গোলযোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাড়িতে বসাইয়া নামে নামে এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না করিলে সুশৃঙ্খল সাহায্য

অসম্ভব, এই ছিল তাঁহার অভিমত। পঞ্চাশ হইতে একশ'টি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইল; সমগ্র বাংলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিয়া ফেলা হইল। প্রতি কেন্দ্রে এক একটি বড় শস্যাগার—সেখান হইতে গ্রামের শস্যভাণ্ডারে খাদ্য পাঠান হইত। একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী প্রতি সপ্তাহে কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষ দমনের এই প্রচেষ্টা—সকল দিক দিয়া ইহাকে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইহা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে।

কিন্তু সেবার এত সুব্যবস্থার মধ্যেও চাউল রপ্তানি হইতেছিল। স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১২ই অক্টোবর (১৮৭৩) তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে ভারত-সরকারকে সতর্ক করিয়া অনুরোধ জানাইলেন যেন—(১) অবিলম্বে সেবাকার্য শুরু করিয়া দেওয়া হয়; (২) বাহির হইতে চাউল আনিবার বন্দোবস্ত হয়; এবং (৩) ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বড়লাট চাউল রপ্তানি বন্ধ করিতে রাজি হইলেন না; সেক্রেটারি অব স্টেটকে তাঁহার আপত্তির বিষয়ে জানাইলেন। যে সব ভারতীয় কুলি মরিসস ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ সিংহল ও অন্যান্য দেশে গিয়াছে (বেশির ভাগই ইউরোপীয় বাগিচায় কাজ করিতে) চাউল বন্ধ করিলে তাহাদের উপায় কি? ১৯৪৩ অব্দে অবিকল ইহারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। সিংহলের ভারতীয় কুলি, ভূমধ্যসাগরের ভারতীয় সৈন্য—তাহাদের সকলের ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইয়াছে। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে সুব্যবস্থা যত কিছু হইয়াছিল, কিছুই গ্রহণ করি নাই; কেবল সেবারকার চাউল রপ্তানি নীতিটা বহাল রাখিয়াছিলাম। *

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ সংগৃহীত উপাদানের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

# বাংলার সঙ্কট

আজ আমরা এক বিরাট জাতীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। গবর্নমেণ্টের কোন কোন মুখপাত্রের পক্ষ হইতে এই কথা প্রকারান্তরে বলিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যের ফলেই বর্তমান দুরবস্থা আসিয়াছে। ঐ মন্ত্রিমণ্ডলীর দোষগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। কিন্তু একটি ব্যাপার আমাদের সকলের নিকট সুস্পষ্ট। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য অকপট চেষ্টা করিয়াছিলেন; যেখানে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই, সেখানেও তাঁহারা উহার কারণ বাংলার জনসাধারণ বা ব্যবস্থা পরিষদের নিকট হইতে গোপন রাখেন নাই। বাংলাদেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহার জন্য মন্ত্রীদের কিছুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। একদিকে ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত এবং অন্যদিকে গবর্নরের হস্তক্ষেপ ও বাধাদানই ঐ জন্য দায়ী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অপসারণনীতি, ভারতের বাহিরে খাদ্যশস্য রপ্তানি এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে চাউল-ক্রয়ের বিষয়ে উল্লেখ করা যায়।

তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিদারুণ শঙ্কার মধ্যে অতিবাহিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করিলেন, জাপান ব্রহ্ম-জয় শেষ করিয়া বাংলায় অভিযান করিবে; শত্রুর অসুবিধা ঘটাইবার জন্য সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও অপরাপর যানবাহন এবং চাউলের অপসারণ একান্তরূপে আবশ্যক। তখনকার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব পরিষ্কাররূপে বলিয়াছিলেন, গবর্নর ও কতিপয় স্থায়ী কর্মচারী বাধাদানের মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছেন; উহার ফলে মন্ত্রিমণ্ডলীর অবলম্বিত নীতি কার্যে পরিণত করা অসম্ভব।

বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ আজ গর্ব করিতেছেন, ঐ বিভাগে খ্যাতিমান ভারতীয় কর্মচারীরা রহিয়াছেন। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী যখন এই বিভাগে ভারতীয় কর্মচারী লইবার চেষ্টা করেন, তখন গবর্নর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে উহা পণ্ড করিয়া দেন; বিভাগের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ য়ুরোপীয় ছাড়া আর কাহাকেও দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। ঐসব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য, তাঁহারা যে নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। সেই কর্মচারীরা এখনও নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন—কাহারও কাহারও পদোন্নতিও হইয়াছে; কিন্তু বাংলা দেশে তাঁহারা যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হিসাব খতাইয়া দেখিবে কে? বে-সামরিক সরবরাহ-বিভাগ পরিচালনার জন্য হাইকোর্ট হইতে একজন জজকে আনা হইল। তিনি দ্রুত স্বস্থানে ফিরিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী কি কি করিয়াছিলেন এবং কি কি করিতে পারেন নাই, তাহার আলোচনা আজিকার দিনে প্রাসঙ্গিক নয়। গত মার্চ মাসে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয়; আক্রমণের প্রধান অস্ত্র ছিল, খাদ্য-সমস্যার সমাধানে উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলীর তথাকথিত অসমর্থতা। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ঐ বিষয়ে কি করিয়াছেন, আমি আজ সেই প্রশ্ন করিতেছি। ক্ষমতা-লাভের প্রারম্ভ হইতে ইঁহারা যে সকল সুযোগ পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইয়াছে কিনা, এবং এই প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইঁহারা কাজ করিয়াছেন কিনা, সেই কথা নিরাসক্ত ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

সরবরাহ-সচিব নূতন পদ পাইবার পর হইতে বিবৃতির পর বিবৃতি দান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমার দু-একটি কথা আছে। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী অন্তত একটি বড় কাজ করিয়াছিলেন—বাংলায় যে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব রহিয়াছে, একথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারত-সরকারকে দিয়া তাঁহারা স্বীকার করাইয়াছিলেন, খাদ্যশস্যের স্বল্পতায় এই প্রদেশ গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে। ইহা গত মার্চ মাসের কথা। এপ্রিল মাসে সুরাবর্দি সাহেব বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পাইলেন। মনোরম ভাষায় তিনি বহু বিবৃতি দিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও অপর বহু বিবৃতি বাহির হইয়াছে। সেইসব বিবৃতি আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি।

বাংলাদেশে খাদ্যের স্বল্পতা নাই, চাউলের অভাব নাই;—বণ্টন-ব্যবস্থার দোষে, ছোট ছোট মজুতদার, সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকদের দোষে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—এই কথা বারম্বার ঘোষণা করিয়া বাংলার দুর্ভাগ্য অধিবাসীদিগের সহিত সরববাহ-সচিব এক বিরাট প্রতারণা করিয়াছেন। কেন ইহা করিলেন, ঈশ্বরই জানেন।

সুরাবর্দি সাহেবের এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলী খাদ্যশস্যের স্বল্পতার উপরেই জোর দিতেন; তাঁহাদের খাদ্যনীতির ইহা দুষ্ততম অংশ। ইহা ১৭ই মে তারিখের ব্যাপার। সরবরাহ-সচিব বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে বাংলার অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটাইবার মতো যথেষ্ট খাদ্যশস্য রহিয়াছে। আমাদের প্রতিপক্ষ সদস্যবৃন্দ মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেবের নিকট কৈফিয়ৎ চান। কোন্ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংলার অধিবাসীদিগের

পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য আছে? সুরাবর্দি সাহেব আরও বলেন, এই সম্পর্কে এক বিস্তৃত হিসাবের অঙ্ক শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে; তাহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে খাদ্যের প্রাচুর্য রহিয়াছে। কোথায় সে হিসাব?

বাংলা গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে বাংলা ও ইংরাজিতে নিম্নলিখিতরূপ এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়:

আবেদন ও সতর্কবাণী

An Appeal and a Warning

দরিদ্র জনসাধারণকে আর উৎপীড়ন করা চলিবে না।

You must not grind the faces of the poor.

সুরাবর্দি সাহেব কাহাকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিতেছেন? *বাংলার লোককে? না, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া তিনি নিজেকেই সম্বোধন করিতেছেন?*

সত্যই কি বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে? না, নিশ্চয়ই না।

Is there a real shortage of food in Bengal? No, most certainly no.

জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুর্গতি সত্ত্বেও সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, খাদ্যের প্রকৃত অভাব নাই। তিনি বলিতেছেন—

তবে আসল ব্যাপারটা কি? এ বৎসরের শেষ পর্যন্ত আমাদের অভাব মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য আমাদের ছিল এবং তাহা ছাড়া অন্যান্য দেশ হইতে আজ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি হইতেছে। আড়তদার, ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন কৃষক এবং আরো অনেকে আতঙ্কবশত অথবা জনসাধারণকে নির্মমভাবে শোষণ করিবার আশায় প্রচুর খাদ্যশস্য গোপনে জমা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক সরকারি ভাবে যে সকল কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, উপরোক্ত বিবৃতিটি তাহার অন্যতম। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই; প্রচুর খাদ্যসম্ভার রহিয়াছে, দেশের অধিবাসীরাই নিজেদের দুঃখ-দুর্গতি সৃষ্টির জন্য দায়ী,—ইহাই মোট কথা।

বড় বড় মজুতদার, বড় বড় আড়তদার বা বড় বড় মুনাফাকারীদের মজুত মালের সন্ধান করা হইল না। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ এবং কৃষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইল, তাহারাই নাকি দরিদ্র সাধারণকে উৎপীড়িত করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিত হইল। গবর্নর এবং স্থায়ী সরকারি কর্মচারিবৃন্দের আশীর্ভাজন বাংলার নব মন্ত্রিমণ্ডলী যেই ইহা ঘোষণা করিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে কমন্স-সভাতেও অনুরূপ কথা উচ্চারিত হইল। মিঃ আমেরি বলিলেন, ভারতবর্ষে এবং বাংলায় কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই; লোকে শস্য মজুত করিতেছে এবং রেশনের অব্যবস্থা রহিয়াছে; গবর্নমেণ্ট সমস্যার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই যে চিত্র অঙ্কন করিলেন, ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি উহা হাতে লইয়া পার্লামেণ্ট হইতে জগতের নিকট ঘোষণা করিতে পারিলেন, পূর্ব-রণাঙ্গনের প্রান্তবর্তী বাংলায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে—দিল্লি অথবা কলিকাতার গবর্নমেণ্ট কর্তৃক কোন ভ্রান্তনীতি অনুসরণের ফলে নয়; অধিবাসীরাই স্বার্থপর—তাহারা বাধা-উৎপাদক মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে।

সুরাবর্দি সাহেব ঘোষণা করিলেন, বাংলায় প্রচুর খাদ্য রহিয়াছে; তাঁহার কাজ, এই খাদ্য-সঞ্চয় খুঁজিয়া বাহির করা। এক বক্তৃতায় তিনি

ঘোষণা করিলেন, চাউল বাহির করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি নিজে গৃহস্থের তক্তপোষের নিচে প্রবেশ করিবেন। রাত্রিতে, এমন কি দিনের বেলাতেও যদি সুরাবর্দি সাহেব সত্য সত্যই গৃহস্থের বাড়ি ঢুকিয়া তক্তপোষের নিচে যাইতে আরম্ভ করেন! আমি জানি, অনেক গৃহস্থ খবর শুনিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জগদীশ্বর গৃহস্থদের রক্ষা করুন! যাহাতে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্যা লইয়া ইহার চেয়ে নির্বোধ আচরণ আর কি হইতে পারে?

সুরাবর্দি সাহেব আরও একটি কারণ দেখাইলেন; বলিলেন, সমস্যাটি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত। অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কবে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন, আমার জানা নাই। তাহা হইলে তাঁহার স্থান কলিকাতায় না হইয়া রাঁচিতে হওয়া উচিত ছিল।

সমস্যাটি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত! অতএব, কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে? লোককে শুধু বলিতে হইবে, 'আতঙ্কগ্রস্ত হইও না। আমি সরবরাহ বিভাগে সচিব হইয়া বসিয়াছি। তোমাদের বলিতেছি, প্রচুর খাদ্যশস্য রহিয়াছে। আমাদের কাছে হিসাবের অঙ্ক আছে—তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। ভয় পাইও না।' গবর্নমেণ্টের মুখপাত্র হিসাবে হয়তো তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস-দানের চেষ্টা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু রাইটার্স-বিল্ডিং হইতে কেবল এইরূপ যাদুদণ্ড নাড়িয়াই কি তিনি সাফল্যলাভ করিতে চান?

বিভিন্ন দলের নিকট পরামর্শ-গ্রহণের প্রয়োজন হইল না; তিনি কেবল মনস্তত্ত্বের কথা ও শিথিলভাবে সহযোগিতার কথা বলিতে লাগিলেন। জনমতের সমর্থন চাহিলেন না; অকপটভাবে সকলের সহযোগিতা কামনা করিলেন না। দলগত নীতির প্রভাব

তিনি অতিক্রম করিতে পারিলেন না। ১৭ই মে তারিখে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গকে আহ্বান করা হইল। সকলেই (মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রশংসায় মুখর য়ুরোপীয় দল পর্যন্ত) দাবি করিলেন, কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্বে গবর্ণমেণ্টের সমগ্র কার্যক্রম নেতৃবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। সরবরাহ-মন্ত্রী ও প্রধান-মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেন, যে পরিকল্পনার কথা গবর্নমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন তাহার অনুলিপি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে দেওয়া হইবে। অতঃপর দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইল। নিতান্ত আনাড়ি ও অক্ষম লোকের দ্বারা পরিচালিত খাদ্য-অভিযান কার্যত আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে অকস্মাৎ বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গকে পরিষদ-গৃহে ডাকা হইল। ইতি-মধ্যে আমাদিগকে কয়েকটি মফস্বল শহরে যাইতে হয়; সেখানে অন্য লোকে সরকারি পরিকল্পনার অনুলিপি আমাদের হাতে দিল। উহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। ৮ই অথবা ৯ই জুন হইতে ঐ পরি-কল্পনা অনুযায়ী কাজ হইবে, এই উপদেশ সহ উহা সমগ্র প্রদেশে বিলি করা হইয়াছিল। খাদ্য-অভিযান যখন আরম্ভ হইবার কথা, তাহারই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ ও মন্ত্রীদের মধ্যে আলো-চনার এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

এই অভিযান-পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া পরিষদকে বিপন্ন করিতে চাহি না। দেশের মধ্যে এমন কেহ নাই, মজুত খাদ্যশস্যের হিসাব-গ্রহণে যে আপত্তি করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অনেক পূর্বেই এই হিসাব লওয়া উচিত ছিল। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীও এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্নর সে সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। তিনি বলেন, উহার প্রয়োজন নাই; বাংলার সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চল হইতে নৌকা ও চাউল অপসারণ সম্পর্কে অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য রহিয়াছে। অন্যথা

জাপানিরা আসিয়া পড়িলে তাহারা ঐ সকল সম্পদের সুবিধা পাইবে।

শুধুই যদি হিসাব-গ্রহণের ব্যাপার হইত, তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিত না। কিন্তু যে পরিকল্পনা হইয়াছিল, হিসাব-গ্রহণ অপেক্ষা তাহার ব্যাপকতা অনেক অধিক। বাংলার এক দূরবর্তী অঞ্চল হইতে আজ সকালেই আমি একখানি বাংলা প্রচার-পত্র পাইয়াছি। যে পরিকল্পনার জন্য সুরাবর্দি সাহেব মৌলিকতার দাবি করেন, এই প্রচারপত্রই তাহার ভিত্তি। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পল্লীউন্নয়ন বিভাগ হইতে মিঃ ইস্‌হাকের স্বাক্ষরিত এক সার্কুলার প্রকাশিত হয়। দিনের পর দিন চিন্তা করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার অধিবাসীদের উপকারার্থ যে পরিকল্পনা আবিষ্কার করিয়াছেন—দেখা গেল, এই সার্কুলার হইতেই তাহার উৎপত্তি। কেবল একটি ব্যাপারে সুরাবর্দি সাহেবের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, উদ্বৃত্ত শস্যের হিসাব করিবার সময় দরিদ্র-পরিবারে চারি বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের বাদ দিতে হইবে; তাহারা ভাত খায় না, ধরিয়া লইতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেব এই সহজ কথাটিও কি জানেন না যে, 'হরলিকস্ মিল্ক' অথবা ধনিগৃহের অন্য কোন শিশুভোগ্য খাদ্য গরিবদের ছেলেরা খাইতে পায় না? পল্লীউন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ইস্‌হাক কিন্তু চারি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হিসাবে ধরিয়াছিলেন। সুরাবর্দি সাহেবের পরিকল্পনায় শিশুদের কার্যত অনশনে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

খাদ্য-অভিযানের ফল কি হইয়াছে? গোড়া হইতেই আমরা বলিয়াছিলাম, অতি-মূল্যবান সময়ের গর্হিত অপব্যয় ছাড়া এই অভিযানে কোন লাভ হইবে না। ভারতরক্ষা-বিধি অনুসারে এক আদেশ জারি

করা হইল, স্বরাষ্ট্র-বিভাগের নিকট পরীক্ষার জন্য পেশ না করিয়া কোন সংবাদপত্র খাদ্য-অভিযান সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবে না। মিঃ সিদ্দিকির ভাষায় 'যাঁহারা স্বাধীনতাকে বাধা-মুক্ত করিতেছেন'—ইহাই তাঁহাদের কর্তৃত্বের নমুনা। যাহারা পরিকল্পনার মূলগত ত্রুটি ধরাইয়া দিতে চাহে, অথবা তাহার আলোচনা করিতে চাহে, এইভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ করা হইল। সম্মিলনে আমরা গবর্নমেণ্ট-কর্মচারীদের এবং সুরাবর্দি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মন্ত্রিমণ্ডলী কার্যত কি করিতে চাহেন? যাহা লইয়া এত হৈ-চৈ হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে কি? ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। একস্থানে মন্ত্রিমণ্ডলী বলিয়াছেন, গ্রামগুলিকে তাঁহারা স্বাবলম্বী করিতে চাহেন—স্থানিক স্বাবলম্বন প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; স্থানীয় প্রয়োজন পূরণ হইবার পূর্বে কোনও স্থান হইতে তাঁহারা উদ্বৃত্ত চাউল অপসারণ করিতে চাহেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলাম, ধনী ব্যবসায়ী ও মুনাফাকারীদের বাংলার সর্বত্র অবাধে কাজ চালাইয়া যাইতে সম্মতি দেওয়া হইতেছে। শকুনির মতো এই সকল ব্যবসায়ী ও মুনাফাকারী বিচরণ করিতে লাগিল। ভারতরক্ষা-বিধি প্রযুক্ত হইবে, বলপূর্বক চাউল আটক করা হইবে—এইরূপ নানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত লোকেরা যে চাউল বাহির করিল, ইহারা অত্যধিক মূল্যে তাহা কিনিয়া কলিকাতা অঞ্চলে সরাইয়া দিল। ফলে পল্লী-অঞ্চলে যে চাউল পাওয়া যাইতেছিল বা পাওয়া যাইতে পারিত তাহা অপসারিত হইল; সমগ্র পল্লী-অঞ্চল এইরূপে চাউল-শূন্য হইয়া গেল। কাগজপত্রে ছাড়া ঘাটতি পূরণের কোন চেষ্টাই হয় নাই। সুরাবর্দি সাহেব বিবৃতিতে বলেন, খাদ্য-অভিযানের ফলে মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই ধরণের তিনটি

বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন চাউল অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ক্ষিপ্রবেগে মূল্য বাড়িতে লাগিল, তখন সকল বিবৃতির অবসান ঘটিল। বিগত এক পক্ষকাল মূল্য সম্পর্কে নীরব থাকিয়া সুরাবর্দি সাহেব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এখনও বাংলার সকল অঞ্চল হইতে আমার কাছে সংবাদ আসে নাই। কিন্তু যথোচিত দায়িত্ব সহকারে আমি বলিতেছি, ১৯৪৩ অব্দের ২৫শে জুনের কাছাকাছি সময়ে চাউলের যে মূল্য ছিল, আটটি জেলায় তাহা হইতে মন প্রতি ৩৲ হইতে ৫৲ বর্ধিত হইয়াছে। শিলিগুড়িতে ৪৷৷০ ; রংপুরে ৪৲ ; মাণিকগঞ্জে ৪৲ ; ময়মনসিং-এ ৪৲ ; নেত্রকোনায় ৬৲ ; যশোহরে ৫৷৷০ ; খুলনায় ৫৲ ; সাতক্ষীরায় ৫৲ বাড়িয়াছে। অন্যান্য স্থানের অবস্থাও প্রায় এই প্রকার। খাদ্য-অভিযান হইতেই আমাদের এই লাভ হইয়াছে।

কলিকাতা এবং হাওড়াকে এই অভিযান হইতে কেন বাদ দেওয়া হইল? মন্ত্রিমণ্ডলী যদি অকপট ইচ্ছা লইয়া আন্তরিকতার সহিত কাজে নামিতেন, তাহা হইলে কলিকাতা ও হাওড়াতেই প্রথম কাজ শুরু হইত। ইস্পাহানি-কোম্পানি ও অন্যান্য ধনী মুনাফাদারদের মজুত মালের হিসাব কি কারণে লওয়া হইল না? সরবরাহ-সচিবই বলিয়াছেন, এই প্রদেশের দরিদ্র অধিবাসীদের জন্য ইস্পাহানি-কোম্পানি চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রকার আরও অনেক য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। অভিযানের সময় কেন ইহারা বাদ থাকিয়া গেল?

কারণ ঐ সমস্ত ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করা সহজসাধ্য নয়। এমন সব স্থান রহিয়াছে, যাহার কাছে ঘেঁসিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুরাবর্দি সাহেবের সাহসে কুলায় না। মন্ত্রিমণ্ডলীকে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। তাই অভিযান

প্রধানত দরিদ্র গৃহস্থ এবং কৃষকদিগের বিরুদ্ধে চলিল। এখন অবশ্য কলিকাতায় হিসাব-গ্রহণ করিতে বলা একেবারে নিরর্থক। সুরাবর্দি সাহেবেরই একজন সমর্থক এক প্রচারপত্রে বলিয়াছেন কলিকাতায় এখন যদি খাদ্য-অভিযান চালান হয়, তাহাতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। চাউল ইতিমধ্যেই এখান হইতে অন্যত্র অপসৃত হইয়া যাইবে।

খাদ্যশস্যের ঘাটতি সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেব আমাদিগকে কোন খবর জানান নাই। তিনি বলিতেছেন, তথ্য-সংগ্রহ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই তথ্য কখনও প্রকাশিত হইবে না। কারণ তাহাতে প্রতি অঞ্চলেই বিপুল ঘাটতির বিবরণ প্রকাশ পাইবে। তিনি বলিয়াছেন, যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ষাট-সত্তর লক্ষ মন উদ্বৃত্ত চাউল হস্তগত হইয়াছে। এই হিসাব আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ইহাতে ঘাটতির কথা ধরা হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি যে পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে ভুল নাই তো? আশা করি সুরাবর্দি সাহেব উত্তর প্রদান কালে তাঁহার বিবৃতিটা আবার যাচাই করিয়া দেখিবেন। কয়েক দিন পূর্বে কলিকাতার এক সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ আট নয় লক্ষ মণ হইবে; ষাট সত্তর নয়।

ষাট-সত্তর লক্ষ এবং আট-নয় লক্ষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। কিন্তু যদি সত্তর লক্ষও হয় তাহা হইলে মিঃ ডেভিড হেনড্রি যেরূপ বলিয়াছেন—ইহা বাংলার অধিবাসীদিগের মাত্র পনর দিনের খাবার। তাহাও যদি কোন অঞ্চলে কিছুমাত্র ঘাটতি না থাকে। ইহার পরে কি হইবে? সুরাবর্দি সাহেবকে আমি এই পরবর্তী অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমরা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, খাদ্য-অভিযানে মানুষের প্রয়োজনের

অনুরূপ মজুত মাল কখনই বাহির হইবে না। আমরা বলিয়াছিলাম, 'আপনাদের নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া সমগ্র দায়িত্ব জনসাধারণের উপর আরোপ করিতেছেন। এই বিষয়ে ব্যর্থ হইলে তাহার পরে আপনারা কি করিবেন?' তিনি বলেন, 'তাহা আমি জানি না।'

[ মিঃ সুরাবর্দি বলিলেন, তিনি একথা বলেন নাই। ]

আপনি নিশ্চয় বলিয়াছেন, 'আমি জানি না।' আপনি যদি তাহা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।

[ মিঃ সুরাবর্দি বলিলেন, পরে কি করা যাইবে তাহা তিনি জানেন না—এই কথাই বলিয়াছিলেন। ]

তিনি স্বীকার করিতেছেন, পরে কি করা যাইবে তাহা তিনি জানিতেন না। অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সে সম্পর্কে কোন কিছু ঠিক না করিয়াই কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পক্ষে কি এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত হইয়াছিল? এই প্রকারেই কি তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন?

[ মিঃ সুরাবর্দিকে অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলিতে শোনা গেল। ]

ওরূপ ভাবে কিছু বলিয়া লাভ হইবে না। যদি সুরাবর্দি সাহেব বলেন যে খাদ্য-অভিযান ব্যর্থ হইলে পরে কি পন্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা তিনি জানতেন না, তাহা হইলে আমি বলিব তিনি দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন; স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই।

মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠনমূলক কার্যাবলী অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিস্তীর্ণ অবাধ-বাণিজ্যমণ্ডলের কথা এবার কিছু বলিব। সুরাবর্দি সাহেব ইহাকে প্রকাণ্ড বিজয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্যর নাজিমউদ্দিন

আরও ফলাও করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা পূর্ব-ভারতে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছি।' বাংলায় এক কণিকা চাউল আনয়ন না করিয়াই অথবা জনসাধারণের বিন্দুমাত্র উপকার না করিয়াই আজ সেই অবাধ-বাণিজ্য অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য এই সুযোগে সুরাবর্দি সাহেব রহস্যময় সর্তে ইস্পাহানি সাহেবকে বাংলা গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে একমাত্র ক্রেতা নিযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। আমি বলিতে চাই, স্থির সিদ্ধান্তের অভাব, ব্যস্ততা এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা-দান করিবার আগ্রহে মন্ত্রিমণ্ডলী অবাধ-বাণিজ্য পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; গোড়া হইতেই গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। বাংলাদেশকে সেবা করিবার এক বিরাট সুযোগ তাঁহারা এইভাবে হারাইয়াছেন।

বিহার এবং উড়িষ্যা সম্পর্কে সুরাবর্দি সাহেব কি করিয়াছেন? পরিষদ-গৃহে মেজাজ হারাইয়া লাভ নাই; তাঁহাকে উত্তর দিতেই হইবে। আমি তথ্য প্রদান করিয়াছি, তাঁহাকেও তথ্যপূর্ণ উত্তর দিতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেব কেন বিহার ও উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্টের সহিত আলোচনা করেন নাই? ধনী ব্যবসায়ী এবং অপরাপর বেসরকারি লোককে তিনি চাউল কিনিবার অখণ্ড স্বাধীনতা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ফল কি হইয়াছে? চাউলের মূল্য সেখানে ৬৲ ৮৲ এবং ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ ও ১৮৲ টাকার মধ্যে ছিল। যে কোনও দামে চাউল কিনিবার জন্য প্রচুর টাকা লইয়া বাংলা হইতে লোক চলিয়া গেল; দুর্ভিক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দাবানলের ন্যায় বাংলা হইতে উড়িষ্যা এবং বিহারে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী ও উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবহারে অবশ্য পার্থক্য আছে। উড়িষ্যার মন্ত্রী সাহসিকতার সহিত ভয়াবহ অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন; বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের জন্য মাত্র একটি জেলা বালেশ্বর

হইতেই এক পক্ষ কালের মধ্যে সত্তর জন লোকের অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় সংবাদ গোপন করিয়া অবিরত সরকারি দায়িত্ব এড়ানো হইতেছে। এইভাবেই আমরা প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সহানুভূতি এবং সহযোগিতা হারাইয়াছি।

বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে ব্যবসায়ীদের বাধামুক্তভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সস্তাদরে চাউল কিনিয়া লাভবান হওয়াই তাহাদের মতলব। উড়িষ্যা-গবর্নমেণ্ট ইহাতে বাধা দিলেন; বিহার-গবর্নমেণ্টও সেই পন্থা অনুসরণ করিলেন। সুরাবর্দি সাহেব পরে তাঁহাদের সহিত আলোচনা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলিতে চাই, সর্বপ্রথমেই এই আলোচনা করা বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর একান্ত করণীয় ছিল। কি কারণে সুরাবর্দি সাহেব তখন উড়িষ্যা ও বিহারে যাইতে দ্বিধা করিয়াছিলেন? পাকিস্তানের সমর্থক হিসাবে তিনি ভবিষ্যৎ হিন্দুস্থানের অংশ বিহার ও উড়িষ্যার নিকট অনুগ্রহ চাহিতে যাওয়া পছন্দ করেন নাই—কারণ কি ইহাই? হায় রে, পাকিস্তানের অর্থনীতিক ভিত্তি যে ধ্বসিয়া পড়িতেছে! পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ দুর্গ বাংলাকেই পার্শ্ববর্তী হিন্দু প্রদেশসমূহের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে। সুরাবর্দি সাহেবকে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া বাংলা ও ভারতবর্ষের সমস্যার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত কিছুতে সম্ভব হইবে না।

আমি প্রশ্ন করিতেছি, কি কারণে সুরাবর্দি সাহেব বিহার-সরকার এবং উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে গিয়া পূর্বাহ্ণে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করেন নাই? কেন তিনি বলেন নাই, আমরা অনশনে আছি, আপনারা কি পাঁচ দশ লক্ষ মন করিয়া চাউল বাংলাকে দিতে পারেন না? ব্যবসায়ী এবং দালালেরা যথেচ্ছ আচরণে মূল্য বিপর্যস্ত করিয়াছে;

DEPOSITED LIBRARY
Acc No. ...

ইহার সুযোগ না দিয়া বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যার গবর্নমেণ্ট একত্র বসিয়া মূল্য সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলী এই প্রণালীতে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

ইস্পাহানি-কোম্পানিকে বাংলা-গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে একমাত্র ক্রেতা নিযুক্ত করিবার সম্পর্কে এইবার আমি আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখি, ইস্পাহানি সাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছু বলিবার নাই। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদারদের আমি চিনি না বলিলেই চলে। বস্তুত ইহা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, নীতিগত প্রশ্ন। মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা যে তাঁহারা একটি বিশেষ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে সোল-এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং দলিল স্বরূপ একটুকরা কাগজ না লইয়াও তাঁহাদিগকে প্রায় দুই কোটি টাকা অগ্রিম দিয়াছেন। বাংলা গবর্নমেণ্ট এবং ইস্পাহানি কোম্পানির মধ্যে চুক্তিসম্পর্কিত একটি দলিলও কি সুরাবর্দি সাহেব দেখাইতে পারেন? এ বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্দেশ লওয়া হইয়াছিল কি? ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হিসাবে আমরা এখানে বসিয়া বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। বাজেট কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সে বাজেট বিবেচিত হয় নাই সত্য, কিন্তু বিবেচনার জন্য গত সপ্তাহে পেশ করা হইয়াছিল। ইস্পাহানি-কোম্পানিকে যে উপযুক্ত ক্ষমতা ব্যতীত দুই কোটি টাকা বা ততোধিক অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে ঐ বাজেটে তাহার উল্লেখমাত্র ছিল না। সাধারণ তহবিল হইতে অননুমোদিত ও একেবারে বে-আইনি ভাবে উহা ব্যয় করা হইয়াছে।

আমি অভিযোগ করিতেছি, বাংলা-গবর্নমেণ্ট ও ইস্পাহানি-

কোম্পানির মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন সর্ত চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলীর যদি সাহস থাকে, তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করুন। এ বিষয়ে কোন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই। ইহাদের সহিত যে সকল সর্ত হইয়াছে, অন্য কাহাকেও সে সর্তে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বাংলা-গবর্নমেণ্ট যে জামিনের দাবি করেন, ইস্পাহানি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে এত টাকা একটি ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইল, যাহার একজন অংশীদার মিঃ সুরাবর্দির দলের প্রধান সমর্থক। ইহার চেয়ে গুরুতর কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য বঙ্গসন্তানের সেবাই নাকি ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য! জিজ্ঞাসা করি, তাহার জন্য এই অসাধারণ পন্থা কেন অবলম্বন করা হইল? কেন টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই? সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন, চেম্বার অব কমার্সগুলির পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরিষদ-গৃহে এমন নির্লজ্জ মিথ্যা আর কখনও উচ্চারিত হয় নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই। গতকল্য মাড়োয়ারি চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি বলেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ হয় নাই। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আমাকে বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সহিতও কোনপ্রকার পরামর্শ হয় নাই। বাংলার জনসাধারণকে এবং ব্যবস্থা পরিষদকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য কেন এই চেষ্টা? ইস্পাহানি-কোম্পানি চল্লিশ লক্ষ টাকা মুনাফা ছাড়িয়াছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কি বুঝাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমি জানি না। সম্ভবত সুরাবর্দি সাহেব তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন। আমার অনুমান, ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-রূপ ঘটিয়াছে। অবশ্য আমার

প্রদত্ত এই অঙ্কগুলি সম্পূর্ণ আনুমানিক। ধরা যাক, ইস্পাহানি-কোম্পানির নিকট পাঁচ লক্ষ মন চাউল আছে। কলিকাতার বাজার দরে তাহা প্রতি মন ৩০৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইস্পাহানি কোম্পানি হয়তো এই সময় বলিলেন, "আমরা আপনাদের নিকট এই চাউল প্রতি মন ২২৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিব।" ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, প্রতি মনে ইস্পাহানি কোম্পানি ৮৲ টাকা মুনাফা ছাড়িয়া দিয়াছেন; চাউলের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ মন হইলে মুনাফা হইতে মোটের উপর চল্লিশ লক্ষ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, কি মূল্যে ইস্পাহানি-কোম্পানি ঐ চাউল কিনিয়াছিলেন? দশ টাকা, বারো টাকা, পনের টাকা,—কি মূল্যে? এই সম্পর্কে কোন তদন্ত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নয়?

কোন্ নীতি অনুসারে বাংলা-গবর্নমেণ্ট তাঁহাদের অনুগৃহীত মুনাফাকারীদের আশ্রয় দিতেছেন? বাংলার অধিবাসীদের অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশায় ডুবাইয়া কেন এই সকল ব্যক্তিকে কাঁপিতে দিয়াছেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর সমর্থক যে মুসলমান সদস্যগণ বসিয়া আছেন তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্যাপারটিকে দলগত প্রশ্ন হিসাবে না দেখিয়া নিরাসক্তভাবে সমগ্র পরিস্থিতির কথা বিচার করেন। ইহা মুসলীম লীগ, কংগ্রেস অথবা কোন দল-বিশেষের প্রশ্ন নহে।

পূর্বতন মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকালেও ইস্পাহানি-কোম্পানির সহিত এক বেনামি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু জানা গিয়াছে, গবর্নরের আদেশ অনুসারে জয়েণ্ট-সেক্রেটারি উহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই পরিষদ-গৃহেই ফজলুল হক সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার উক্তির এখন পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ হয় নাই।

ইস্পাহানি-কোম্পানি যখন গবর্নমেণ্টের এজেণ্ট রূপে কাজ করিবেন

তাঁহারা নিজেদের হিসাবে চাউল কিনিবেন না, এইরূপ কথা হয়। কিন্তু ইস্পাহানি কোম্পানি এই সর্তে রাজি হন নাই। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতিক্রমে নিজেদের হিসাবেই তাঁহাদিগকে চাউল কিনিবার অনুমতি দিতে হইবে। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সর্ত সম্বন্ধে এখনো কিছু ঠিকঠাক হয় নাই, অথচ ইতিমধ্যেই মুসলীম-লীগ দলের অনুগৃহীত এই সদস্যের হাতে সরকারি তহবিল হইতে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহার তুলনায় অনেক সামান্য অভিযোগে মিঃ হেনড্রি এবং তাঁহার দল ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিতে বিরত হন। প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে এই ধরণের কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। মিঃ হেনড্রি এবং তাঁহার দল এখন কি করিবেন? ঐ ওখানে তাঁহারা শান্ত মেষশাবকের ন্যায় বসিয়া আছেন। মিঃ হেনড্রি মন্ত্রিমণ্ডলীকে সার্টি-ফিকেট দিয়াছেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট হইতেও আবার পালটা সার্টিফিকেট প্রত্যাশা করিয়াছেন। 'আমি তোমার পিঠ চুলকাইয়া দিতেছি, তুমিও আমার পিঠ চুলকাইয়া দাও'—ব্যাপারটা এই রকম আর কি!

[ সরকার-পক্ষ হইতে একজন বলিলেন, 'ইঁহারা আপনাদেরও পিঠ চুলকাইয়াছিলেন।' ]

ইঁহারা আমাদের পিঠ চুলকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সত্য কথা। কিন্তু পরে দেখিলেন, ব্যাপারটি তাঁহারা যেরূপ প্রত্যাশা করেন, তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমরা তাঁহাদের খুশি করিতে আদৌ প্রস্তুত নহি। তখন গত মার্চ মাসে য়ুরোপীয় দল বিরোধী দলে যোগদান করেন।

মিঃ ম্যাকইন্স্ কেন পদত্যাগ করেন, মিঃ সুরাবর্দির নিকট

হইতে পরিষদ সে কথা জানিতে চাহেন। মিঃ ম্যাকইন্‌স্‌ বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করেন, ইহা কি সত্য নয় ?

বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যেভাবে সরবরাহ-বিভাগের কাজ চালাইতেছিলেন তাহাতে অতি মাত্রায় অসন্তুষ্ট হইয়াই মিঃ ম্যাকইন্‌স্‌ চলিয়া যান। তিনি কি বলেন নাই,—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কোন বিশেষ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি বিভাগের কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে এই রকম লোক-দেখানো মারফতিভাবে কাজ না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ঐ ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সহিত গবর্নমেণ্টের কাজ চালানো উচিত ? এই বিষয়ে আমি মাত্র আর একটি কথা বলিব—

[ সিদ্দিকি সাহেব অস্পষ্ট ভাবে কি বলিলেন। ]

সিদ্দিকি সাহেব আমাকে বাধা দিতেছেন। তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে, তাহাতে আমি আনন্দিত। সেদিন সিদ্দিকি সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে তিনি কোন দল-বিশেষের মুখ চাহিয়া কাজ করেন না। তাঁহার ধৈর্য হারাইবার প্রয়োজন নাই—আমিই তাঁহার নিকট এইবার একটি নিয়মতান্ত্রিক সমস্যা উপস্থিত করিতেছি। মে লিখিত 'পার্লামেণ্টারি প্র্যাকটিশ'-এর প্রথম অধ্যায় ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাউস অব কমন্সের কোন সদস্য যদি গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টর হন, তাঁহার ভোট দিবার অথবা হাউস অব কমন্সের সদস্য থাকিবার অধিকার থাকে না। ইহা আইন-সমর্থিত একটি প্রথা। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সুস্পষ্ট বিধানের উপর এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত। মিঃ সিদ্দিকি নিয়মতান্ত্রিকতা এবং ইংল্যাণ্ড, তুরস্ক, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হনলুলু প্রভৃতি সর্বস্থানের পার্লামেণ্টীয় বিজ্ঞতার জন্য বিখ্যাত। তিনি কি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, উপরোক্ত

নীতি অনুসারে মিঃ ইস্পাহানি অথবা অন্য যে কোন গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টরের পক্ষে আর পরিষদের সদস্য থাকা উচিত হইবে না ?

[ সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, প্রাক্তন মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলেও কণ্ট্রাক্টর ছিল। ]

কোন পরিষদ-সদস্য যদি সে আমলে গবর্নমেণ্ট-কণ্ট্রাক্টর রূপে কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে কোনও প্রকার সহানুভূতি দেখানো বিধেয় নয়। বস্তুত, এই কপটতা বাংলার জনসাধারণের সম্মুখে নগ্নভাবে উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হইতেছে বণ্টনের পদ্ধতি। আমি খুব সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। গবর্নমেণ্ট বলিতেছেন, কণ্ট্রোল-দোকান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহারা আট শত পর্যন্ত সরকারি দোকান খুলিবার কল্পনা করিতেছেন। কণ্ট্রোল-দোকানের পক্ষ হইতে ওকালতি করিতেছি না। আমি জানি, প্রধানত দুই কারণে কণ্ট্রোল-দোকানগুলি ব্যর্থ হইয়াছে : (১) সরবরাহের অভাব, এবং (২) কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনাচার। যদি অনাচারের জন্য কণ্ট্রোল-দোকানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে নির্মমভাবে সেই অনাচার দূর করিতে হইবে ; ইহাতে কেহ কোন-প্রকার দোষ দিবে না। কিন্তু ব্যবসায়ের স্বাভাবিক পথ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট-করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? গবর্নমেণ্টের বণ্টন-নীতির সহিতও ইহার কোন সামঞ্জস্য নাই। ক্রয় সম্পর্কে কিন্তু আমি এরূপ কথা বলিতেছি না ; সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

বণ্টন সম্পর্কে কি জন্য এই প্রস্তাব হইতেছে যে, ব্যবসায়ের সাধারণ পন্থা বর্জন করিয়া সরকারি দোকান খুলিতে হইবে ? প্রস্তাবিত

দোকানের স্বরূপ কি হইবে? কি মূল্যে কাহাদের উপর উহার ভার দেওয়া হইবে? কি কি বিষয় আলোচনা করিয়া কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঐ সকল দোকান খোলা হইবে? পূর্বতন মন্ত্রিমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তি অন্তত তিন বৎসর কাল ব্যবসায়ের সহিত লিপ্ত না থাকিলে সে কণ্ট্রোল-দোকান পাইবার অধিকারী হইবে না। এই নিয়মটি অনাচারনিবারণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ছিল। কি কারণে ইহা উপেক্ষিত হইল? সাম্প্রদায়িক এবং দলগত ভিত্তিতে অনুগ্রহ-বণ্টনের পক্ষে নিয়মটি কি প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল?

অধিক-খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন কিরূপ চলিতেছে? এই বিষয়ে সরকারের গঠনমূলক প্রস্তাব সম্পূর্ণত আমরা জানিতে চাই। প্রচার-কার্য লোক ভুলাইবার পন্থা মাত্র; কাগজের উপরে খাদ্য উৎপন্ন হইবে না। প্রতিদিন আমরা বাংলার বহু অঞ্চল হইতে চিঠি পাইতেছি, কৃষির উপযোগী বীজের অভাব; গবর্নমেণ্ট যদি এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসরও ভাল আমন ধান জন্মিবে না। সমস্ত প্রদেশ প্রায় চাউলশূন্য হইয়াছে, তাহার উপর যদি পরবর্তী আমন ধানের আশাও অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে বাংলা দেশের কি শোচনীয় পরিণতি ঘটিবে? মন্ত্রিমণ্ডলী সংবাদ পাইতেছেন কিনা জানি না—দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা রোগে অসংখ্য গবাদি পশু মারা পড়িতেছে। সামরিক উদ্দেশ্যেও প্রচুর পরিমাণে গবাদি ক্রয় করা হইতেছে। এই পরিষদেরই জনৈক সদস্য সম্প্রতি স্বগ্রাম হইতে আসিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার চোদ্দটি বলদের ভিতর তেরোটি বসন্তে মারা গিয়াছে, একটিমাত্র জীবিত আছে। ইহাই বাংলার সাধারণ অবস্থা। আগামী কয়েক মাসে নানা সংক্রামক ব্যাধি-বিস্তারের

ফলে বাংলার জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে, তাহার কথা কি মন্ত্রিমণ্ডলী চিন্তা করিতেছেন? নিঃশেষিত-জীবনীশক্তি লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসীর উপর উহা চরম আঘাতের ন্যায় পতিত হইবে। অনশন এবং রোগে যাহাতে মানুষের মৃত্যু না ঘটে, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে?

প্রতিকারের উপায় কি?

উপায়, গবর্নমেণ্টকে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিতে হইবে এবং দুর্ভিক্ষ-প্রতিকারের জন্য সহৃদয়তার সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে। গবর্নমেণ্ট পরিশোধের কিছুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিবেন না, গ্রাম্য-কমিটী সামর্থ্য অনুসারে যাহা হয় করিবেন, এই ভিত্তিতে স্বল্পাবশিষ্ট চাউল বলপূর্বক ধার করিবার নীতি-প্রয়োগ অথবা স্বাবলম্বন সম্পর্কে সস্তা উপদেশ দান—এই সকলের পরিবর্তে বাংলার অধিবাসীদের আহার্য যোগাইবার পূর্ণ দায়িত্ব গবর্নমেণ্টকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলী হয় জনসাধারণকে খাওয়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন, নতুবা পদত্যাগ করুন। কার্যত যখন ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টেরই পূর্ণ শাসন চলিতেছে, তাঁহারাই অধিবাসীদের খাওয়াইবার এবং প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

মূল-সমস্যা সমাধানের জন্য মূল্য ও সরবরাহের পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। মিঃ হেনড্রি ঠিকই বলিয়াছেন, ইহা করিবার তিনটি পন্থা আছে। গবর্নমেণ্ট একাই সমস্ত মাল ক্রয় করিতে পারেন; ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিতে পারেন; অথবা গবর্নমেণ্ট ও ব্যবসায়ী উভয়ে মিলিয়া ক্রয় করিতে পারেন। গবর্নমেণ্ট বাজারে আসিবার ফলেই সমগ্র পরিস্থিতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনই ইহার প্রতিকার হইবে না। ব্যবসায়ীদিগকে অবাধ-ক্ষমতা দিলেও প্রদেশের

শস্য নিঃশেষিত হইবে ; তাহাতে বণ্টন-ব্যবস্থারও সঙ্গতি ও সাম্য রক্ষিত হইবে না। একমাত্র গবর্নমেণ্টই মূল্য এবং সরবরাহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং তাহার ফলে রেশনিং প্রবর্তিত হইতে পারে। রেশনিং-এর অর্থই হইতেছে সরবরাহের সম্পর্কে সরকারি প্রতিশ্রুতি। সরবরাহের সুব্যবস্থা ছাড়া রেশনিং চলিতে পারে না। গবর্নমেণ্ট বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহা রেশনিং নহে ; ইহাতে লোককে কার্যত অনশনে রাখা হইতেছে। সরবরাহ অব্যাহত নাই ; এবং গবর্নমেণ্টও একথা বলিতেছেন না যে, রেশনিং প্রবর্তিত করিয়া তাঁহারা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। যদি সর্বশ্রেণীর মধ্যে সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে ন্যায় ও সাম্যের নীতি অনুসৃত হয়—তাহা হইলে লোকে দুঃখ-ভোগ ও ত্যাগ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে।

কি প্রকার গবর্নমেণ্টের পক্ষে এই দায়িত্ব লওয়া সম্ভব ? বাংলার এই নিদারুণ সঙ্কটের সময় কোন একটি দলের লোক লইয়া গঠিত গবর্নমেণ্টের পক্ষে মূল্য ও সরবরাহের উপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলার ছয় কোটি লোকের আহার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। আমাদের এই বিরোধী দলও যদি গবর্নমেণ্ট গঠন করেন এবং মুসলীম-লীগ বিপক্ষ দলভুক্ত থাকেন, তবু সমস্যার সমাধান হইবে না। বস্তুত আজ দল-গত বৈষম্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে হইবে ; মন্ত্রিমণ্ডলীকে সর্বশ্রেণীর আস্থাভাজন হইতে হইবে। সাহায্য-দানের চেষ্টা অকপট হইবে ; সমস্যাটি জাতীয়তার দিক দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনীতিক এবং দলগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া অগ্রসর হইলে কোনরূপ সমাধান হইবে না। যে সকল দল এবং উপদল একত্র কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলীতে থাকিবেন।

[ শ্রীযুত রসিকলাল বিশ্বাস বলিলেন 'আপনিও তাঁহাদের মধ্যে থাকিবেন তো ?' ]

না, আমি নই। অপরের হস্তের ক্রীড়নক হইতে আমি চাই না। তাহা হইলেও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, এমন যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত লোকের অভাব হইবে না। এই জাতীয়-সঙ্কটের সম্মুখে দলগত মনোভাব একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। ব্রিটিশ-পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল দল-বিশেষের স্বার্থের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, যাহাতে সমগ্র প্রদেশের মঙ্গল সাধিত হয়, এইরূপ কোন মীমাংসায় সকলে মিলিত হইতে পারিলে, তবেই দলগত মনোভাব অন্তর্হিত হইবে।

দু'একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া আমি বক্তব্যের উপসংহার করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উদ্ধৃত করিব না, কারণ তাঁহার অভিমত হয় তো পক্ষপাতদুষ্ট বলা হইবে। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-গণই বলিয়াছেন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যেন অলঙ্ঘ্য রীতি অনুক্রমে একের পর এক ঘটিয়া আসিতেছে। যখন মোগল-সাম্রাজ্যের বাহু বাংলার দিকে বিস্তৃত হইতেছিল, সেই সময় গৌড়রাজ্যে আকস্মিক মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। বিশাল সুন্দর নগর গৌড়—শুধু বাংলার নহে, সমগ্র ভারতের গৌরব ছিল ; এক বৎসরের মধ্যেই উহা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল। হাণ্টার অননুকরণীয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে উহা ব্যাঘ্র এবং বানরকুলের আবাস-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর মোগলসাম্রাজ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিল। কয়েক শতাব্দী পরে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর বলিয়া কথিত ১৭৭০ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরাজরা এই সময়েই বাংলায় আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। আজও আমরা পুনরায়

দুর্ভিক্ষ এবং গুরুতর অর্থনীতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছি। বাংলার সমস্ত অঞ্চল হইতে দুর্গতি দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। একান্ত বশম্বদ মন্ত্রিমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত সুমিষ্ট বাক্যালঙ্কৃত ইস্তাহারে অবস্থার গুরুত্ব গোপন বা লঘু করিবার জন্য যত চেষ্টাই হউক, নিয়তি ইতিহাসের বিস্ময়কর ও ভয়াবহ পুনরাবৃত্তির দিকে অমোঘ অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, বর্তমানে অবিকল তাহাই ঘটিতে যাইতেছে। বিষয়টি আমাদের নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হাণ্টার এই দুর্ভিক্ষের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পরিষদের সদস্যবৃন্দের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনঃসংযোগ করিয়া ব্যাপারটি অনুধাবন করেন। তারপর কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করিতে হইবে, ১৯৪৩ অব্দে কি ভাবে তাঁহারা দায়িত্ব পালন করিতে যাইতেছেন?

[ সিদ্দিকি সাহেব বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। ]

আমি জানি, এই কাহিনী সিদ্দিকি সাহেবকে অতিশয় বিচলিত করিতেছে।

[ সিদ্দিকি সাহেব বলিলেন, 'নিশ্চয়'।

কিন্তু এই পরিষদে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বাংলার হতভাগ্য অধিবাসীদের প্রতি অধিকতর দয়াবান ও সহানুভূতিশীল। দূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া সিদ্দিকি সাহেব অপরিমিত বিত্ত-সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, এই প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য এখনো যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র সহানুভূতি না হইয়া থাকে, তবে আমরাই তাঁহাকে করুণা করিব।

১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে হাণ্টার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে দেওয়া হইল—

১৭৭০ অব্দে সমস্ত গ্রীষ্মকাল ধরিয়া শ্বাসরোধী গরমের মধ্যে মানুষ মরিতে লাগিল। কৃষকেরা গোরু ও চাষের যন্ত্রপাতি বিক্রয় করিল, বীজ-ধান খাইয়া ফেলিল, পুত্রকন্যা পর্যন্ত বেচিল। শেষে আর পুত্রকন্যা কিনিবারও লোক পাওয়া যায় না। লোকে গাছের পাতা এবং মাঠের ঘাস খাইতে লাগিল। ১৭৭০ অব্দে দরবারের রেসিডেন্ট স্বীকার করিলেন, জীবিতেরা মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে। দিন-রাত্রি অনশনক্লিষ্ট এবং রোগগ্রস্ত হতভাগ্যেরা স্রোতের ন্যায় নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল।.....মুমূর্ষু এবং মৃতদেহের স্তূপে রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল বন্ধ হইল। শবদেহের সৎকারও আর সম্ভব হইল না। এমন কি প্রকৃতির সম্মার্জক শিয়াল-কুকুরেও মৃতদেহ খাইয়া শেষ করিতে পারে না। বিকৃত এবং গলিত শবের স্তূপে নাগরিকদের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল।

মেকলে তৎকৃত লর্ড ক্লাইবের জীবন-চরিতেও অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—

যে সকল নিতান্ত কোমলাঙ্গী অন্তঃপুরিকা কখনও বাড়ির বাহিরে আসেন নাই, যাঁহাদের অবগুণ্ঠন কখনও লোকচক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত হয় নাই, তাঁহারাও পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সন্তান-সন্ততির জন্য একমুষ্টি চাউল পাইবার নিমিত্ত ভূলুণ্ঠিতা হইয়া উচ্চ বিলাপে পথিকদের করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিজেতা ইংরেজদের প্রমোদোদ্যান এবং অট্টালিকা-তোরণের অতি-নিকটে সহস্র সহস্র মৃতদেহ প্রতিদিন হুগলি-নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মৃত এবং মুমূর্ষুর জন্য কলিকাতার রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হইল। রুগ্ন ও দুর্বল দেহ লইয়া যাহারা বাঁচিয়া থাকিল, আত্মীয়দের শবদেহের সৎকার করিবার অথবা গঙ্গাজলে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিবার উৎসাহ তাহাদের ছিল না। প্রকাশ্য দিবাভাগে শিয়াল এবং শকুনির দল মৃতদেহ ভক্ষণ করিত; তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছাও কাহারও হইত না।"

ইহা অতিরঞ্জিত কাহিনী নয়। আজ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমরা অবিকল এইরূপ বিবরণই পাইতেছি। আজই আমি ছয়-সাত

খানা চিঠি পাইয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাইলাম, উপরের বর্ণিত অবস্থাই ঘটিতে শুরু হইয়াছে। পরিষদের কাছে আমি প্রশ্ন করিতে চাই, এই দুর্দৈবের প্রতিকার কি? বাংলার জীবন-প্রবাহ যদি অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, তবে আমরা কোথায় থাকিব, আমাদের দলই বা কোথায় থাকিবে?

এই মন্বন্তর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘটে নাই; যাঁহারা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ শাসনের জন্য দায়ী, তাঁহাদেরই অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী পরাধীনতার ফলে অধিবাসীরা আজ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষের কারণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মেকলে বলিয়াছেন, 'প্রাকৃতিক কারণ, নিঃসন্দেহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ, উহারই অব্যবহিত পূর্বে ইংরেজশাসনের অব্যবস্থা।' মেকলের কথাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ব্রিটিশ ফ্যাক্টরির প্রত্যেকটি ভৃত্য তাহার প্রভুর সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল; প্রভুও কোম্পানির সর্ববিধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এইভাবে কলিকাতায় প্রচুর সম্পদ দ্রুত পুঞ্জীভূত হইল; আর সেই সঙ্গে তিন কোটি মানুষ দুর্গতির চরম অবস্থায় উপনীত হইল।

সুমহৎ বৃটিশ-শাসনের তখন ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা চলিতেছে। সেই শোকাবহ চিত্র মেকলের অপেক্ষা সুন্দরতর রূপে কেহই আঁকিতে পারেন নাই।

এদেশের লোক যথেচ্ছাচারের মধ্যে বাস করিতে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু এমন যথেচ্ছাচারিতা তাহারা আর দেখে নাই। কোম্পানির ক্ষুদ্র অঙ্গুলিটিও সিরাজদ্দৌলার কটিদেশ অপেক্ষা স্থূলতর। মুসলমান-আমলে অন্তত একটি প্রতিকারের উপায় ছিল,

অমঙ্গল নিতান্ত দুঃসহ হইলে, 'জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়া গবর্নমেণ্ট বিচূর্ণ করিয়া দিত। কিন্তু এই গবর্নমেণ্টকে অপসারিত করার উপায় ছিল না। কোম্পানির সেই আমলকে মনুষ্য-চালিত গবর্নমেণ্ট না বলিয়া দুষ্ট অপদেবতার সহিত তুলনা করা সঙ্গত।

প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল; ইহা সেই সময়ের চিত্র। আজ আমরা ১৯৪৩ অব্দে পৌঁছিয়াছি। কিন্তু নিজের দেশ ও জাতির সেবা করিবার পক্ষে এবং দেশবাসীকে রক্ষা করিবার পক্ষে আমাদের সামর্থ্য কি কিছুমাত্র বাড়িয়াছে? অধিবাসীদের বাঁচাইবার সর্বশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ব্রিটিশ-শাসকবর্গের উপর। তাঁহারা এই পরম দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া যাহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত জড়িত আছে কেবল সেই সকল লোককে খাওয়াইতে চাহিয়াছেন।

মিঃ ডেভিড হেনড্রি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আমরা পূর্ব-রণাঙ্গনের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছি। কি ভাবে এই যুদ্ধ জয় করা যাইবে? যদি বাংলা অনশনে থাকে, বাংলাদেশ যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ-জয়ের কি বেশি সুবিধা হইবে? মানুষের মনের সাহস এবং দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি কি সে অবস্থায় অব্যাহত রাখা যাইবে? আজ যে আমরা এই দুঃখভোগ করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশের কি অপরাধ? কাহার দোষে ব্রহ্মের পতন ঘটিয়াছিল? কাহার দোষেই বা সিঙ্গাপুর হস্তচ্যুত হয়? বাংলা তাহার জন্য দায়ী নয়, তবে কেন বাংলার অধিবাসীরা দুঃখভোগ করিবে? ভারত-গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে অবিলম্বে আমাদিগকে খাদ্য-শস্যের সরবরাহ পাইতে হইবে।

[ য়ুরোপীয় দলের মধ্য হইতে বলিতে শোনা গেল, "আপনার বন্ধু তোজোর কাছে যান না কেন?" ]

য়ুরোপীয় দলের নিকট হইতে আমরা এই ধরণের কথাই প্রত্যাশা করি। সদস্য মহাশয় কি সত্য সত্যই বলিতে চান, চাউল ও খাদ্যের জন্য ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্টের দিকে না তাকাইয়া তোজোর কাছে চাওয়া আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? হাউস অব কমন্স-এ এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য মিঃ আমেরিকে তিনি কি পরামর্শ-দান করিবেন? তিনি বলিতেছেন, তোজো আমাদের বন্ধু। কে যে আমাদের বন্ধু—ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহা বলিয়া দিবে। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আপনাদের সহিত সম্পর্কিত হইবার ১৭০ বৎসর পরেও বাংলাকে যদি এই প্রকার অনশনে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু নহেন।

ভারত-গবর্নমেণ্টের দায়িত্ব সম্পর্কে একটু আলোচনা করিব। হিসাবের অঙ্কের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। ১৯৪৩ অব্দে বাংলার জন্য দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার টন গম নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ শান্তির সময়ে বাংলার জন্য নির্দিষ্ট গমের পরিমাণ আড়াই লক্ষ টন। অতএব বর্তমান গুরুতর জরুরি অবস্থার জন্য বাংলাকে কোন অতিরিক্ত গম দেওয়া হয় নাই। আবার ১৯৪৩ অব্দের জন্য নির্দিষ্ট এই গমের মধ্যে কি পরিমাণ অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে? মাত্র পঞ্চাশ হাজার টনের কাছাকাছি অর্থাৎ যাহা নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার শতকরা পঁচিশ ভাগ। সুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছেন, চাউলের পরিবর্তে বাংলার অধিবাসীদের জোয়ার ভুট্টা ও বজরা খাইতে হইবে। ১৯৪৩ অব্দে বাংলার জন্য উহা দুই লক্ষ টন নির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু পৌঁছিয়াছে মাত্র দশ হাজার টন। অতএব সুরাবর্দি সাহেবের ফাঁকা বক্তৃতা এবং বাজে প্রতিশ্রুতিতে কি লাভ হইবে? যদি অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আনা না যায় এবং ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে খাদ্যশস্য বাংলায় পাঠানো

না হয়, তাহা হইলে ভারত-সরকারের পক্ষেই বা মধ্যে মধ্যে ভ্রান্তি-জনক ইস্তাহার বাহির করিবার সার্থকতা কোথায়? পরিষদের প্রত্যেক ভারতীয় সদস্যকেই এইজন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলীকে এমন শক্তিশালী এবং প্রতিনিধিমূলক হইতে হইবে, যেন ভারত-গবর্নমেণ্ট ব্রিটিশ-গবর্নমেণ্ট অথবা বাংলা-গবর্নমেণ্টের আসল প্রভুগণ তাহাকে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ না হন। ইংল্যাণ্ডে প্রধান-মন্ত্রীর নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠানো হউক যে, গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে; প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বাংলায় প্রেরণ না করিলে সম্মিলিত জাতিবর্গেরই স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহাকে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গণ্য করা হউক; এ সম্পর্কে আর কোন জোড়াতালি চলিতে দেওয়া হইবে না। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিতে যদি অসমর্থ হন তবে মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করিয়া দায়িত্ব পরিহার করুন। তখন দেখিব, গবর্নর এবং তাঁহার কর্মচারি-বৃন্দের সাহায্যে দেশের শাসনকার্য কি ভাবে চলিতে পারে? সুরাবর্দি সাহেব যদি ইহা করিতে পারেন—

[ সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, তিনি এবিষয়ে একমত। ]

আমি জানি, সুরাবর্দি সাহেবের চৈতন্যোদয় আরম্ভ হইয়াছে। সত্যই যদি তিনি একমত হন, তাহা হইলে দলগত আনুগত্য এবং দল-নেতৃত্ব তিনি পরিত্যাগ করুন। জাতি, সম্প্রদায় ও বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে তখন আমরা সমবেত দাবি উপস্থিত করিব এবং এই চরম-সঙ্কটের মুহূর্তে সকলে ঐক্যবদ্ধ হইব।*

---

* ১৮ই জুলাই, ১৯৪৩ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্মানুবাদ।




ঠেকা ঠেক ?

আমি প্রস্তাব করি—

খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে যে-সামরিক সরবরাহ-সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন, পরিষদের মতে উহা একেবারে নৈরাশ্যজনক। খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন এবং বাংলার অধিক শস্যোৎপাদন সম্পর্কে মন্ত্রিমণ্ডলী যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা ছিল না; ঐ নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। খাদ্য-পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়া প্রদেশের সর্বত্র যে শোচনীয় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, মন্ত্রি-মণ্ডলী কর্তৃক অনুসৃত নীতিই তাহার জন্য দায়ী। সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া সম্প্রতি তাঁহারা চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে আইন জারি করিয়াছেন, তাহার ফলে লোকের দুর্দশা বহু গুণ বাড়িয়াছে। মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহ করিতে এবং মনুষ্য-জীবন রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রিমণ্ডলী সভ্য-সরকারের পক্ষে অবশ্যপালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই।"

পরিষদের গত অধিবেশনে খাদ্য-পরিস্থিতির আলোচনার পর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। ইহা বর্তমানে বাংলার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর জীবন-মরণের দূরপ্রসারী সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরবরাহ-সচিবের বিবৃতি আদৌ সন্তোষজনক নয়। ইহাতে দূরদৃষ্টির পরিচয় নাই, ইহা কেবল শূন্যগর্ভ বাক্যে পরিপূর্ণ। ফলের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বলা যায়, সরকারি খাদ্যনীতি একেবারে বিফল হইয়াছে। আমার প্রতি এবং অপর যাঁহারা লোকের দুর্দশা-লাঘবের

চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি সুরাবর্দি সাহেব যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছেন, আমি তাহার উল্লেখ করিতে চাই না। ঘৃণাই এই ঘৃণ্য আক্রমণের একমাত্র প্রত্যুত্তর। বিপুল অযোগ্যতা এবং অবিবেচনা হইতেই এরূপ আক্রমণের প্রবৃত্তি জন্মে। সুরাবর্দি সাহেব নিজের মন ও চরিত্রের আলোকেই অপরাপরমানুষ ও ঘটনাবলীর বিচার করিয়াছেন।

আজ আমরা দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি। দুঃখ-দুর্গতির—বিশেষত যাহারা পল্লীঅঞ্চল হইতে আসিতেছে তাহাদের দুরবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারি, এমন সময় আমার নাই। সে কাজ আর কেহ করিবেন। অনশন এবং অনশনজনিত রোগে মৃত্যুর হার অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে আত্মহত্যা করিতেছে,পুত্রকন্যা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, বেওয়ারিশ মৃতদেহ যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেছে—এইরূপ অসংখ্য মর্মান্তিক বিবরণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট আসিতেছে। দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলিকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় পড়িয়া মানুষ মরিতেছে ; এ. আর. পি.র বেড খালি পড়িয়া থাকিতেও তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হয় নাই। গবর্নমেণ্ট সম্প্রতি কলিকাতায় হাসপাতাল খুলিয়াছেন ; কিন্তু বিভিন্ন মফস্বল-কেন্দ্রে আজিও ঐরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

গত সপ্তাহে আমি মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। লঙ্গরখানায় আহারের জন্য আসিয়া আমার সম্মুখেই দুইজনের মৃত্যু হইল। আহার্য-দর্শনে এক ব্যক্তি এতটা উত্তেজিত হয় যে, মুখে অন্ন পৌঁছিবার পূর্বেই লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে অপসারিত করিতে হয়। অভিযোগ আসিল, মেদিনীপুরের হাসপাতালে বেড খালি থাকিতেও লোকে রাস্তায় পড়িয়া মরিতেছে। আমি সিভিল-সার্জন এবং

উপস্থিত লোকজনের নিকট এ বিষয়ে অনুসন্ধান করি। শুনিলাম, মেদিনীপুর হাসপাতালে এ. আর. পি.-র জন্য চল্লিশটি বেড সব সময়েই রিজার্ভ রাখিবার নিয়ম। এই বেড সাময়িকভাবেও ব্যবহার করিতে দিবার ক্ষমতা কালেক্টরের পর্যন্ত নাই; গবর্নমেণ্টের আদেশ আবশ্যক।

কাঁথিতে শিয়াল-কুকুরে যথেচ্ছ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। এইসব জন্তুকে গুলি করিয়া মারিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। এই ধরণের একটি ঘটনা কাঁথির অধিবাসী কয়েক ব্যক্তি আমার গোচরে আনয়ন করেন। যে কাহিনী শুনিলাম, তাহা ধারণার অতীত। কলিকাতায় নিরাশ্রয় ও অনশনক্লিষ্ট লোকদের অবস্থা যত হৃদয়-বিদারক হউক—মফস্বলের শহরে ও গ্রামে যাহা ঘটিতেছে, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত কঙ্কালসার নর-নারী ও শিশুর দল জাতিবর্ণনির্বিশেষে আহারের অভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। এরূপ অসংখ্য দৃশ্য আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভূমিহীন গৃহহীন দরিদ্র-শ্রেণীর দুর্গতির মাত্রা অবশ্য সর্বাধিক; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও যে সকল পরিবার সাধারণ সময়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেন, আজ নিতান্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁহাদিগকে মৃত্যু-বরণ করিতে হইতেছে। ইঁহারা আমাদের সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের মেরুদণ্ড। জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক যথার্থ সেবা চিরদিন ইঁহারাই করিয়া আসিয়াছেন। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ইঁহাদের রক্ষা করিতেই হইবে।

আগামী কয়েক মাসে বাংলার মৃত্যুর হার যে কত ভয়াবহ হইবে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যাহারা কোন প্রকারে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহারা এত জীবনীশক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, কখনো তাহারা আর কার্যক্ষম হইতে পারিবে না।

পরিষদের গত অধিবেশনে আমি হাণ্টার-রচিত 'পল্লী-বাংলার কাহিনী' এবং মেকলে-রচিত 'লর্ড ক্লাইবের জীবনী' হইতে ১৭৭০ অব্দ ও তন্নিকটবর্তী সময়ে বাংলাদেশের ধ্বংস ও মৃত্যু-বর্ণনা শুনাইয়াছিলাম। তাহার পরে ১৭০ বৎসরের বেশি অতিক্রান্ত হইয়াছে। আজ ১৯৪৩ অব্দেও বাংলার সমাজ ও জীবন-পরিবেশের পক্ষে হাণ্টার ও মেকলের মন্তব্যগুলি সমান ভাবে প্রযোজ্য।

ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ কর্ডন স্মিথকে একবার বাংলাদেশ পরিদর্শনের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। বাংলার দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে নাটকীয় অত্যুক্তি হইয়াছে, এইরূপ নির্মম সমালোচনা বাংলা দেশ স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়া তারপর তিনি যেন করেন। বাংলার এই সঙ্কটে ভারতবর্ষের সকল অংশের বে-সরকারি লোকদের নিকট হইতে অজস্র সাহায্য পাওয়া গিয়াছে; অর্থ, আশ্রয়স্থান, খাদ্যশস্য এবং কর্মী দিয়া সাহায্য করিবার বহু প্রস্তাব আসিয়াছে। যে বিরাট সঙ্কটের আমরা সম্মুখীন হইয়াছি, এই সব সাহায্য তাহার তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত সন্দেহ নাই,—তবু বাংলার জন্য দেশব্যাপী এই সহানুভূতি প্রাদেশিক ব্যবধানের প্রাচীর চূর্ণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতির বাস্তবতা সকলের চক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই সহানুভূতি লক্ষ লক্ষ ক্লিষ্ট লোকের হৃদয়ে সাহস ও দৃঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে; ইহা জনমত জাগ্রত করিয়াছে, গবর্নমেণ্টকে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের—এমন কি ভারতের বাহিরের দেশ-সমূহেরও মনোযোগ বাংলার দুঃখ-দুর্দশার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমি বরাবরই বলিতেছি, জনসাধারণের প্রত্যেক শ্রেণীকে—প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে দুর্গতদের দুঃখ-লাঘবের কার্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে।

কিন্তু অধিবাসীদের খাওয়াইবার, সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার এবং মানুষের জীবন যাহাতে রক্ষা পাইতে পারে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব প্রধানত ন্যস্ত রহিয়াছে দেশের গবর্নমেণ্টের উপর। সরকারি নীতির বিস্তৃত সমালোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। উহা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার সম্ভাবিত কারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান একান্ত রূপে আবশ্যক। এই অনুসন্ধান দোষ ধরিবার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া পরিচালিত হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য হইবে, আপোষের দ্বারা অথবা জনমতের চাপ দিয়া শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করা।

গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আমার প্রথম অভিযোগ, বাংলাদেশের ভিতরে এবং দেশের বাহির হইতে যে উপায়ে খাদ্যশস্য-সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা বিশেষ আপত্তিজনক। মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমেই বেপরোয়া ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন, বাংলায় খাদ্যশস্যের অভাব নাই; শস্য মজুত করিবার ফলেই বর্তমান দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। আজ ভুল ভাঙিয়া গিয়াছে। সরবরাহ-সচিব স্বীকার করিতেছেন, খাদ্যশস্যের তীব্র অভাব রহিয়াছে। এ যাবত কাল তিনি মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন; ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ মাস কাল ভ্রান্ত-নীতির অনুসরণ করিয়াছেন।

জুন মাসে যে খাদ্য-অভিযান হইয়াছিল, তাহার ফলে বাংলার পল্লী-অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য অন্যত্র চলিয়া যায়। অভিযানের ফল আজও প্রকাশিত হয় নাই; গবর্নমেণ্টের তাহা প্রকাশ করিবার সাহসই নাই। আমরা প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেকটি মহকুমার হিসাব জানিবার দাবি করিতেছি। গবর্নমেণ্টের মতে কোন্‌গুলি ঘাটতি অঞ্চল এবং কোন্‌গুলি উদ্বৃত্ত অঞ্চল তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন।

খাদ্য-অভিযানের সময় এবং তাহার পরেও ব্যবসায়ী ও আড়তদার-দের যে-কোন মূল্যে চাউল ক্রয় করিতে দিয়া গবর্নমেণ্ট মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। কি পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করা হইয়াছে, কোথায় তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং কোথায়ই বা তাহা রহিয়াছে, সে কথা আমরা জানিতে চাই। ঘাটতি অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। কোথাও কোথাও গুদাম আটক করিয়া সীল করা হইয়াছে। সেই সব জায়গাতেই লোকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তবু গুদামজাত মাল মজুত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রদেশের সর্বত্র হইতে আউশ ধান ক্রয়ের পরিকল্পনার ফলে পল্লী-অঞ্চলের অবস্থা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ন্যায় অঞ্চল হইতেও ধান্য ক্রয় করিয়া অপসারিত করিতে গবর্নমেণ্ট উৎসাহ দান করিয়াছেন—ইহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। আজ সকালেই এক ভদ্রলোক কালনা হইতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, গত কয়েকদিন ইস্পাহানি-কোম্পানি গবর্নমেণ্টের এজেণ্ট রূপে কালনা অঞ্চল হইতে অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার মন চাউল কিনিয়াছেন। সকলেই জানেন, বিগত বন্যার ফলে এবং নিদারুণ অর্থ-সঙ্কটে কালনা অঞ্চলে লোকের কি নিদারুণ দুর্গতি হইয়াছে।

বাহির হইতে খাদ্য-আমদানি সম্পর্কে জানিতে পারা গেল, বাংলায় প্রেরিতব্য খাদ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ জুলাই মাসে ভারত-গবর্নমেণ্ট সংশোধন করিয়াছেন; পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বলিতে পারি না, পরিষদের কত জন সদস্য এ বিষয়ে অবগত আছেন। শোচনীয় সঙ্কট-সময়ে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিতে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী কেন সম্মত হইলেন? মন্ত্রিমণ্ডলীর নাকি গত্যন্তর ছিল না, ভারত-সরকার এ বিষয়ে নাকি কোন কথাই শুনিতে রাজি ছিলেন না।

জিজ্ঞাসা করি, মন্ত্রিমণ্ডলী এই হ্রাস করিবার প্রস্তাবে কি জন্য প্রাণপণে বাধা দেন নাই? বাংলার সম্পর্কে যখন এইরূপ অবিচার করা হইল, তখন আত্মসমর্পণ না করিয়া তাঁহারা কেন পদত্যাগ করেন নাই?

[ সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও হ্রাস করা হইয়াছে। ]

সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন, বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর আপত্তি সত্ত্বেও শস্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে বাংলা দেশ জানিতে চাহিবে, মন্ত্রিমণ্ডলী আদৌ কেন এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন? কেন তাঁহারা বলেন নাই, 'বাংলার জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস করা হইলে আমরা পদত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করিব'?

প্রদেশের বাহির হইতে যে খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা নির্ভুল হিসাব জানিতে চাই। বাংলার জন্য যে পরিমাণ শস্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা কি সমস্তই আসিয়া গিয়াছে? লাহোর হইতে ফিরিয়া সুরাবর্দি সাহেব বলিয়াছিলেন, ফল খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু তিনি ফিরিবার মাত্র দুই দিন পরে পাঞ্জাবের একজন মন্ত্রী বিবৃতি দিলেন যে, বাংলা-সরকার পাঞ্জাব হইতে যে মূল্যে গম ক্রয় করিতেছেন তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যে বাংলার অনশনক্লিষ্ট অধিবাসীদের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছেন।

ইস্পাহানি-কোম্পানিকে বাংলা-সরকারের সোল-এজেণ্ট নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে আমি তদন্ত দাবি করায় সরবরাহ-সচিব আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। নিম্নের বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য জানাইবার জন্য আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি—

(১) ইস্পাহানি-কোম্পানিকে মোট যে টাকা দেওয়া হইয়াছে ( অথবা অগ্রিম হিসাবে যাহা দেওয়া হইয়াছে ), ঐ টাকা দিবার তারিখ ও উহার পরিমাণ।

(২) গবর্নমেণ্ট ও ইস্পাহানির মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার নকল।

(৩) বাংলা-গবর্নমেণ্টের পক্ষে বাংলার বাহিরে যে স্থান হইতে যে সকল লোক বা এজেণ্টের দ্বারা যে তারিখে যে মূল্যে ইস্পাহানি-কোম্পানি খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়াছেন, তাহার বিবরণ।

সাড়ে চারি কোটির অধিক টাকা ইস্পাহানি-কোম্পানিকে দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা সুরাবর্দি সাহেবের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে দেওয়া হয় নাই; বাংলার সরকারি তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের জানিবার অধিকার আছে, এই বিপুল অর্থের প্রত্যেকটি পাইয়ের হিসাবে যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে কি না। মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত এই ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানটির রাজনীতিক সম্পর্কের কথা স্মরণ রাখিলে এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। আমরা বিশেষ নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে সংবাদ পাইয়াছি, বাংলা-গবর্নমেণ্টের নিকট ইস্পাহানি যে মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়াছেন, বহুক্ষেত্রেই তাহা যে সকল স্থান হইতে তাঁহারা চাউল কিনিয়াছেন, সেই সেই স্থানের প্রচলিত বাজার-দর অপেক্ষা অনেক বেশি। ইহার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন। ইহা দোষারোপ অথবা পাল্টা দোষারোপের কথা নয়। মন্ত্রীদের সুনামের যদি কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমি যেসকল তথ্য জানিতে চাহিয়াছি, তাহার পূর্ণ-বিবরণ প্রদান করা তাঁহাদের উচিত হইবে। আমি যাহা জানিতে চাহিয়াছি, তাহা জনস্বার্থেরই পর্যায়ভুক্ত। অত্যন্ত

আপত্তিজনক উপায়ে কাজ-কারবার চালান হইয়াছে ; এই একটিমাত্র ব্যাপার হইতেই উহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডলীর একটি মারাত্মক ভ্রান্তি হইয়াছে, সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ জারি করা। গবর্নমেণ্ট পূর্বাহ্ণেই সমগ্র প্রদেশের হিসাব লইয়াছেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কোথায় সঞ্চিত মাল রহিয়াছে তাহা তাঁহাদের জানা উচিত। সরবরাহের ধারা শুষ্ক হইয়া গেলে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ একেবারে অর্থহীন ; যদি সরবরাহ অব্যাহত থাকে তবেই মাত্র মূল্য-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপকার হইতে পারে। আজ সমগ্র শস্যসঞ্চয় অদৃশ্য হইয়াছে। যদি গবর্নমেণ্ট খোঁজ করিয়া উহা বাহির করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হিসাব-গ্রহণ একটা তামাসার ব্যাপার হইয়াছে ; বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্তমান সময়েও গবর্নমেণ্টের এজেণ্টগণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে এবং তদপেক্ষা অধিক মূল্যেও চাউল কিনিতেছেন। যে সকল অঞ্চলকে শস্যহীন অঞ্চল বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেখান হইতেও নিয়ন্ত্রিত ও তদূর্ধ মূল্যে ক্রয় করা হইতেছে বলিয়া মফস্বল হইতে সংবাদ আসিয়াছে। স্থানীয় কর্মচারিগণও প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেছেন, তীব্র অভাব বিদ্যমান থাকিতেও খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না বলিয়া কোন প্রকার সাহায্য-দান করা যাইতেছে না। বাংলার সমস্ত অঞ্চল হইতে ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে ; অসংখ্য লোককে অনশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। যদি অবিলম্বে ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ; সমস্ত প্রদেশকে অনন্ত দুর্গতির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রয়োজন মতো সরবরাহের দায়িত্ব না লইয়া গবর্নমেণ্ট যেখানেই

ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

শুধু চাউলের কথা বিবেচনা করিলেই চলিবে না—যে সকল অত্যাবশ্যক জিনিষের সরবরাহের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহার প্রায় সবগুলিরই অভাব ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চিনির কথা বলা যাইতে পারে। বর্তমানে চিনি সম্পূর্ণভাবে গবর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু বাজারে চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রিত-মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি। কেন এরূপ হইয়াছে? চিনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; বাংলার প্রাপ্য পরিমাণ সেখান হইতেই নির্ণীত হয়। বাংলার চিনি কেবলমাত্র বাংলা-সরকারের মনোনীত ব্যবসায়ীদের নিকট আসে। এই ব্যবসায়ীরা শুধু তাঁহাদের কাছেই চিনির সরবরাহ করেন, যাঁহারা বাংলা-সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স পাইয়াছেন। বাজারে অথবা অন্য কোথাও এমন কোন তৃতীয় পক্ষ নাই, যাহারা আসিয়া নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায়, এই প্রদেশে চিনির আমদানিকারকদের নির্বাচন দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হয় নাই, রাজনীতিক এবং দলগত ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। বিক্রয়ের জন্য যাঁহাদিগকে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের বেলাতেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। একথা বলিতে চাই না যে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত সকলেই খারাপ লোক। কিন্তু বড় বড় আমদানিকারক এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ী —তাঁহাদের অনেকের নির্বাচনই দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া করা হয় নাই। মূল্যনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হইয়াছে, গবর্নমেণ্ট পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সরবরাহের উৎসের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে,

তবু চোরাবাজার ও লাভের ব্যবসা অবাধে চলিতেছে ; তবুও বাজারে চিনি মিলিতেছে না।

কয়েকদিন পূর্বে এক ব্যবসায়ী ভারত-সরকারের একখানি আদেশ-পত্র আমাকে দেখান। তাঁহাকে সরিষার তৈল সরবরাহ করিতে বলা হইয়াছে। সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রিত-মূল্য প্রতি মন ৩৭৲ বা ৩৮৲ টাকা। ভারত-সরকার ৫০৲ টাকা মন দরে সরবরাহ চাহিয়াছেন।

[ সুরাবর্দি সাহেব বলিলেন, সরিষার তৈলের উহাই নির্দিষ্ট মূল্য। ]

সুরাবর্দি সাহেব বলিতেছেন যে, বাংলা-সরকার পঞ্চাশ টাকাই মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাও মজার ব্যাপার। ভারত-গবর্নমেণ্ট সরিষার তৈলের মূল্য প্রতি মন ৩৮৲ টাকা স্থির করিয়া দিয়াছেন ; আর আমি নিজের চোখে তাঁহাদেরই আদেশ-পত্রে দেখিয়াছি, তাঁহারা পঞ্চাশ টাকা মূল্যে কিনিতে চাহিতেছেন। কাহারা তবে চোরা-বাজার সৃষ্টি করিতেছে, কাহারা অতি-লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে ? একদিকে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর ব্যবস্থা, অপর দিকে ভারত-সরকারের নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ—ইহাদের হাত হইতে বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টকে রক্ষা করিবার উপায় কি ?

বাংলায় বর্তমানে যে বণ্টন-ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা নিতান্তই অসন্তোষজনক। গত কয়েক সপ্তাহ যাবত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্য-শস্য আসিতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। খাদ্যশস্য যদি সত্য সত্যই পৌঁছিয়া থাকে, সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সমভাবে তাহার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন হওয়া উচিত। ইহার জন্য গবর্নমেণ্টের যোগ্যতা ও সততার উপর যে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, বর্তমান গবর্নমেণ্টের উপর তাহা আমাদের নাই। বাংলাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে, সরবরাহের উপর পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং যাহাদের

উপর সর্বসাধারণের বিশ্বাস আছে এমন লোকের দ্বারা বণ্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত করা।

জন-কল্যাণের জন্য ব্যবসায়ী ও সর্বসাধারণকে আহ্বান করিতে হইবে, এবং গবর্নমেণ্টের উপর সর্বশ্রেণীর পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন হইবে। সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের মধ্য হইতে অনাচার ও কলুষ নির্মমভাবে দমন করিতে হইবে। যে সব অন্যায় ও দুর্নীতি চলিতেছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা বিদূরিত করিবার দায়িত্ব গবর্নমেণ্টের উপরই ন্যস্ত। অন্যায় ও দুর্নীতি দূর করিতে তাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প—এই কথা মুখে বলিয়া যদি প্রকারান্তরে তাহাতে উৎসাহ দান করা হয়, তাহা হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অথবা ভয়প্রদর্শন একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়ে।

বাংলায় নিদারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সর্বস্তরের লোকের সহযোগিতা ব্যতীত এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। গবর্নমেণ্টের পরিকল্পনাহীন শাসন-ব্যবস্থা যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা শঙ্কাজনক। গবর্নমেণ্টের কার্য হইতে স্বতঃই মনে হয়, যাহা কিছু খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তাহা বৃহত্তর কলিকাতা-অঞ্চলের জন্যই রাখা হইবে, প্রদেশের অপরাপর অংশকে অদৃষ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। মফস্বলে তীব্র অভাব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রয়োজনের কথা বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছ চাউল ক্রয় করা হইতেছে —এই ব্যাপার হইতেই ন্যায়সঙ্গত বণ্টন সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের কথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। খাদ্যের অভাবে লোক মরিতেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল স্থানেই সঞ্চিত খাদ্যশস্য পড়িয়া রহিয়াছে। বাংলার জনমত এ বিষয়ে অবিলম্বে জাগ্রত হউক। গবর্নমেণ্ট বরাবরই নিদারুণ অব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন। মিঃ আমেরি

কি এখনও এই মত পোষণ করিয়া থাকেন যে, বাংলার লোক অতি-ভোজনের জন্যই কষ্ট পাইতেছে ; তাহাদের—বিশেষত লোভী কৃষকদের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ই এই অবস্থার জন্য দায়ী ? অস্ট্রেলিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে কেন বাংলায় দ্রুত খাদ্যশস্য আমদানি করা হইতেছে না ?

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। আমন ধানের সম্পর্কেও যদি এইরূপ পরিকল্পনাহীন পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে সঙ্কট-মোচনের আর উপায় থাকিবে না। রোগ ও অনশনে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহার এক শতাংশও যদি লণ্ডন অক্সফোর্ড বা এডিনবরার রাজপথে মরিত, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেকটি মানুষ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যাইত ; মন্ত্রীদিগকে ক্ষমতার আসন হইতে সরাইয়া দিত। কিন্তু এখানে সংবাদ চাপিয়া রাখা হয়, অভিপ্রায় আরোপিত হয় ; যাহারা মন্ত্রীদের অযোগ্যতার পরিচয় উদ্ঘাটিত করে অথবা সমালোচনা করে, তাহাদের জন্য বন্দি-শালার দ্বার উন্মুক্ত হয়।

ঘরে-বাহিরে আমাকে এই বলিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে যে, খাদ্যকে আমি নাকি রাজনীতিক কলহের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। য়ুরোপীয় দল এবং যাঁহারা আজ গবর্নমেণ্টের দলভুক্ত তাঁহাদের অনেকেই এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। খাদ্যসমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রাক্তন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য ইঁহারাই ছয় মাস পূর্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন কিন্তু ইঁহারাই বলিতেন, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য এবং জনস্বার্থের জন্যই ঐরূপ দল গড়া হইয়াছে।

আমরা কাহারও নিকট করুণার প্রার্থী নই। আজ আমাদের প্রধানতম কর্তব্য, বাংলা যাহাতে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। লোককে খাওয়াইয়া আপাতত বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার অর্থনীতিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপায়-উদ্ভাবনে সরকার তিলার্ধ সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না।

খুব স্পষ্টভাবেই আমাদের কথা বলিতেছি। খাদ্যকে আমরা রাজনীতিক ক্রীড়াবস্তুতে পরিণত করিতে চাই না। সঙ্কট-মোচনের আমরা প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমরা মনে করি, বর্তমানের বিপজ্জনক অবস্থার জন্য গবর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত নীতিই দায়ী; সেই নীতির এবং গবর্নমেণ্টের সমালোচনা আমাদিগকে করিতেই হইবে। রাজনীতিক দাসত্বই আমাদের বর্তমান অর্থনীতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। বাংলার উপর আজ যে প্রাণঘাতী আঘাত পতিত হইতেছে, সে আঘাত শুধু প্রকৃতির হাত হইতে আসে নাই। এই অর্থনীতিক বিপর্যয়ের মূলে রহিয়াছে শাসন-ব্যবস্থার রাজনীতিক গলদ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বাধীনতার অধিকারী না হইতেছি, ততক্ষণ এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাই। কেন্দ্রে ও প্রদেশে যদি যথার্থ ক্ষমতাপন্ন ও দায়িত্বশীল জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ও বাংলায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হইতে পারিত।

কিন্তু আজিকার অতি-দুঃসময়ে আমি এই বৃহৎ সমস্যার কথা উত্থাপন করিতে চাই না। দলগত রাজনীতিক কলহের কথাও তুলিব না। আজ যে একটি দলবিশেষের গবর্নমেণ্ট বাংলায়

আধিপত্য করিতেছেন, তাহার দায়িত্ব আমাদের নয়। যদি এই গবর্ণমেণ্ট আমলাচক্রের অংশীভূত হইয়া থাকেন এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গের কয়েকজন প্রতিনিধি আমাদের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এই দলগত ব্যাপারে জড়িত হইয়া থাকেন, তাহার জন্যও আমরা দায়ী নই। আমরা অকুণ্ঠে বলিতে পারি, খাদ্য-পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হওয়ায় এই প্রদেশ শাসন করার নৈতিক অধিকার হইতে গবর্নমেণ্ট বঞ্চিত হইয়াছেন। গবর্নমেণ্ট এই অভিযোগ কখনও করিতে পারেন না, বিরোধী দল কেবল সমালোচনা করিয়াই কালহরণ করিতেছেন। বস্তুত আমাদের গঠনমূলক পরামর্শ পদে পদে উপেক্ষিত হইয়াছে। এখন এমন এক অবস্থা আসিয়াছে যে, গবর্নমেণ্ট নিজেদের ভ্রান্ত-নীতি ও কর্মের জটিল জালে নিজেরাই জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

বিরোধী দল অকপটে সদিচ্ছা ও সেবার আগ্রহ লইয়া সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। গবর্নমেণ্টের নীতি এমনভাবে নির্ধারিত হউক যে, তাহা যেন সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। তাহা হইলে অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমরা যথাসাধ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব। কিন্তু গবর্নমেণ্ট যদি তাঁহাদের বর্তমান ভেদ-নীতির অনুসরণ করিতে থাকেন এবং নিজেদের দায়িত্বে পরিকল্পনা তৈয়ারি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন,—তাহা হইলে আমরা বর্তমানের ন্যায় যখন সহযোগিতা যুক্তিযুক্ত মনে করিব তখন সহযোগিতা করিব, আবার বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যখন বিরোধিতা শ্রেয় মনে করিব, তখন কঠোর বিরোধিতা করিতে দ্বিধা করিব না।

বর্তমান মুহূর্তের প্রধানতম কর্তব্য হইতেছে মিলন এবং মানসিক একত্ববোধ। যাঁহারা আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি

অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, এবং দেশের যাঁহারা প্রকৃত প্রভু তাঁহারা কেবল মুখের কথায় নয়—কাজের মধ্য দিয়া দেখাইয়া দেন বাংলাকে রক্ষা করিবার কার্যে অন্তত সাময়িকভাবেও গবর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে সমস্ত রাজনীতিক বিতর্ক স্থগিত রাখিয়া আমরা মিলিতভাবে এই প্রদেশের ধনসম্পদ ও জনসম্পদ একত্র করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিব। *

* ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ।

# খোলা চিঠি

স্যর জন হার্বার্ট অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার জায়গায় বিহারের গবর্নর স্যর টমাস রাদারফোর্ড বাংলার গবর্নর হইয়া আসেন। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৩৪৩ তারিখে তাঁহাকে এই খোলা চিঠি দেওয়া হয়।

প্রিয় স্যর টমাস রাদারফোর্ড, বাংলার ইতিহাসের অতিশয় সঙ্কট-মুহূর্তে নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আপনি শাসক হইয়া আসিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিবাসীদের নিদারুণ দুর্গতির মধ্যে সেবা করিবার অকপট আগ্রহ লইয়া সংস্কার-মুক্ত চিত্তে আপনি আসিয়াছেন, এই আশা করিয়া আপনাকে এই খোলা চিঠি লিখিতে সাহসী হইতেছি। সর্বপ্রথম আপনাকে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে হইবে; বাস্তব পটভূমিতে সমস্ত ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং সর্ববিধ বিভিন্ন মতামত শ্রবণ করিতে হইবে। নিজেকে আপনি আমলাচক্রের মুখপাত্র অথবা মন্ত্রীদিগের কার্যের নির্লিপ্ত দর্শক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।

আজিকার দিনে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন, দল-নির্বিশেষে সরকারি বেসরকারি এই প্রদেশের সমগ্র সম্পদ ও জনশক্তি সার্বজনীন সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। অতীতে যে সকল ভুল করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার জন্য যাহা প্রয়োজন, ততটুকু আমাদের মনে রাখিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি যেন অবিলম্বে প্রত্যক্ষভাবে মনোযোগ প্রদান করেন, এই জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি।

১। যাহাতে অভাব ও অনশনে লোকের প্রাণ ও স্বাস্থ্য-হানি না ঘটে, তজ্জন্য গবর্নমেণ্টকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপরই এযাবত অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রধানত তাহার ফলেই বর্তমান দুরবস্থা। গবর্নমেণ্ট প্রথম হইতেই সাধারণ লোকের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন নাই। বেসামরিক জনসাধারণকে বাঁচাইয়া রাখা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব, যুদ্ধকালে প্রদেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও নিরপত্তা একান্তভাবে আবশ্যক—তাহার জন্যও ইহা অপরিহার্য। ভবিষ্যতে যেন এ সম্পর্কে কোন অসতর্কতা না ঘটে।

২। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে নিয়মিত সরবরাহ পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারত-সরকার বাংলার জন্য নির্দিষ্ট শস্যের পরিমাণ সম্প্রতি হ্রাস করিয়াছেন; উহা বাড়াইতে হইবে। গত ছয় মাস ধরিয়া আমরা এই কথা বলিয়া আসিতেছি, ভারতের বাহির হইতে বিশেষত অস্ট্রেলিয়া হইতে বাংলার খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা আজও কেন করা হয় নাই, বাংলা তাহা জানিতে চায়। যদি দেখা যায় অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি শস্য প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহা হইলে গত বৎসর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মধ্যবর্তিতায় গ্রীস যে ভাবে শস্য পাইয়াছিল বাংলার জন্য সেইভাবে চাউল পাইবার চেষ্টা করা উচিত।

৩। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হইবার পর পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহ হইতে বাংলা-সরকার যে পদ্ধতিতে চাউল ক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় ত্রুটিযুক্ত। টেণ্ডার আহ্বান না করিয়া

মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্কিত কোন অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানকে এজন্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানকে আজ পর্যন্ত চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বাংলা-গবর্নমেণ্টের নিকট ন্যূনতম মূল্যে যাহাতে এই চাউল বিক্রয় করা হয়, তৎসম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি লওয়া হয় নাই, অথবা দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা এই ব্যাপারের তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, কাজ-কারবার যথাযথ উপায়ে এবং বাংলার অধিবাসীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিচালিত হইতেছে না। যদি নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হয় তবে আমরা দেখাইতে পারিব, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার প্রতি কি প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, —দেশবাসীর মঙ্গল বিবেচনা না করিয়া কি ভাবে দলের মধ্যে অনুগ্রহ বিতরণে তৎপর হইয়াছিলেন।

৪। বাংলা দেশের ভিতরে শস্য-সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। গত জুন মাসে বাংলায় যে বহু-বিঘোষিত খাদ্য-অভিযান হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কি ধারণা তাহা আপনাকে অবগত হইতে হইবে। অভিযানের ফলাফল আজিও প্রকাশিত হয় নাই। আমরা দাবি করিতেছি, অবিলম্বে উহা প্রকাশিত হউক। সরকারি হিসাব অনুসারে কোন্ অঞ্চলে ঘাটতি রহিয়াছে এবং কোন্ অঞ্চলেই বা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে আমাদের পক্ষে তাহা জানিবার উপায় নাই। ব্যবসায়ী এবং বড় বড় আড়তদারকে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অত্যধিক মূল্যে অবাধে চাউল কিনিতে দিয়া বাংলার সর্বাধিক ক্ষতি করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে যে শস্য সঞ্চিত ছিল, ইহার ফলে তাহা অপসারিত হইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে সরকারি নীতিই এইরূপ অবাধ-ক্রয়ে উৎসাহ দান করিয়াছে; ইহাতে বহু ব্যাপক দুর্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই গবর্নমেণ্ট মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিলেন। নিয়ন্ত্রণ-প্রবর্তনের পূর্বে বড় বড় আড়তদার এবং ক্রেতাকে দেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া চাউল ও ধান কিনিবার জন্য এক সপ্তাহেরও অধিক সময় দেওয়া হইল। ইহার অপরিহার্য পরিণতি, চোরাবাজার ও ফাটকাবাজারের উদ্ভব। যেখানেই গবর্নমেণ্ট চাউল ক্রয় করিয়াছেন, সেখানেই দুর্গতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। অস্বীকার করি না যে, ঘাটতি-অঞ্চলের অভাব পূরণ করিতে হইলে গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ক্রয় না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু গবর্নমেণ্ট-ক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য বাজারে আসিলে, জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের দায়িত্ব-গ্রহণের জন্যও তাঁহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বর্তমান সরকারি ক্রয়-নীতির আমূল সংশোধন প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসে আমন ধান উঠিবার পূর্বে যদি ইহা সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের রক্ষার উপায় থাকিবে না।

৫। বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করি। আমরা বিবেচনা করি, এই ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক সাম্প্রতিক ইস্তাহার অনুসারে স্থানীয় কর্মচারীরাই বণ্টনের এজেণ্ট-নির্বাচন করিবেন; নির্বাচনের সময় যে সকল বিষয়ের বিবেচনা করা হইবে, সম্প্রদায়গত বিবেচনাও তাহার অন্যতম। বণ্টনের নীতি-নির্ধারণের সময় সরকার যদি দলগত অথবা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে তাহার ফল মারাত্মক হইবে। সরকার কি পরিমাণ শস্য কিনিয়াছেন অথবা জরুরি

প্রয়োজনে আটক করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নই। যে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার বণ্টন-ব্যবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের প্রয়োজন। এই প্রদেশের সমর-বিভাগের সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ কি এবং রেলওয়ে ও বড় বড় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানগুলিই বা কত মাল মজুত রাখিয়াছেন? ভারত-সরকার ঘাটতি পূরণ করিবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়া সঞ্চিত মালের একাংশ বেসামরিক জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না?

৬। বাংলায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের স্বল্পতা আছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা নাই—এই কথা দায়িত্বশীল মন্ত্রিবর্গ গত কয়েক মাস যাবত ঘোষণা করিয়া যেভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন ও মানুষকে ধাপ্পা দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক পীড়াদায়ক। আমন ধান না উঠা পর্যন্ত প্রদেশের প্রয়োজন কতটা তাহা নির্ণয় করা, এবং ন্যায় ও বিচারসঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই বর্তমান মুহূর্তে সর্বপ্রথম কর্তব্য। সরবরাহের পরিমাণ যখন সীমাবদ্ধ, তখন রেশনিং-এর ব্যবস্থা করাই প্রতিকারের উপায়। দুঃখবরণ ও আত্মোৎসর্গের জন্য লোকে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবে সকলকেই স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। সুনিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থাই তাহার ভিত্তি-স্বরূপ হইবে।

৭। বাংলার অধিবাসীরা আজ যে দুর্গতি ভোগ করিতেছে তাহার শোচনীয়তা সম্পর্কে আমি আলোচনা করিতে চাই না। কলিকাতাতেই আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা যথেষ্ট মর্মান্তিক। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে যে সংবাদ আসিতেছে তাহা আরও ভয়ঙ্কর। এক সম্প্রদায়ের লোকের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে—ইঁহারা দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহারা লঙ্গরখানায় আহার্য গ্রহণ করিতে

পারেন না, সরকারের নিকট হইতে দানও গ্রহণ করিতে পারেন না। ইঁহারাই বাংলার রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড। ইঁহারা যদি পিষ্ট ও দুর্বল হইয়া যান, তাহার ফল মারাত্মক হইবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ইঁহাদের দুর্দশা-লাঘবের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে আমরা যে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল বেসরকারি প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন করা গবর্নমেণ্টের কর্তব্য। কিন্তু যে বিরাট সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, বেসরকারি প্রচেষ্টা তাহার সামান্যই করিতে পারে। গবর্নমেণ্টকেই শেষ-দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে; সর্বশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। বাংলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী দল-বিশেষের প্রতিনিধি; তাঁহাদের আবেদন সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে সফল হইবে না।

এই মন্ত্রিমণ্ডলী যে অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশের বিশ্বাসভাজন নহেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার কার্যে ইঁহারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। এই পত্রে আমি দলগত প্রশ্ন তুলিতে চাই না, কিন্তু একটি কথা আপনাকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। খাদ্য-সঙ্কট মাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেই সৃষ্ট হয় নাই, শাসন-ব্যবস্থার রাজনীতিক ত্রুটিও ইহার জন্য দায়ী। যে গবর্নমেণ্ট সমস্ত অধিবাসীর পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এবং যাঁহারা সরবরাহ ও মূল্যের পূর্ণ-নিয়ন্ত্রণে সমর্থ, সেই গবর্নমেণ্টই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারেন। ভারতশাসন-আইন অনুসারে যে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, এই প্রকার গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহাদিগেরও পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে। যদি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় সরকার গঠন করা না যায়, বা ঐ প্রকার জাতীয় সরকারকে

বিশ্বাস করা না যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ-সরকারের প্রতিনিধিরূপে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আপনাকেই সমগ্র দায়িত্ব লইতে হইবে; আপনিই নিজের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম লইয়া বাংলার অধিবাসীদের সম্মুখীন হইবেন। ব্রিটিশ-সরকার এখনও ভারতবাসীদের প্রভু বলিয়া দাবি করেন—অতএব সভ্য গবর্নমেণ্টের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য শাসকবর্গই অগ্রসর হইয়া আসুন।

(৮) পরিশেষে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্বতার শেষ স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, মৃত্যুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে; ইঁহাদের জীবনরক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে নিশ্চয়ই খাদ্য-সরবরাহের প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য-সংগ্রহই একমাত্র সমস্যা নহে। বাঙালী যাহাতে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুযোগ্য এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একদল লোককে গবর্নমেণ্টের পূর্ণ সহযোগিতা লইয়া কাজ করিতে হইবে; বাংলাকে অর্থনীতিক ক্ষয় ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য দূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমাদের এই যে উদ্বেগ, তাহার মধ্যে সমস্যার দূরপ্রসারী দিক্‌টা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। অধিক-খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সরকারি আন্দোলনটি বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই বিভাগের পুনর্গঠন ও ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি: একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই চারি লক্ষ একর জমি দামোদরের বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র জমিতে আমন ধান হইতে পারিত। কয়েক সপ্তাহ-পূর্বে এই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল হইতে ফিরিয়া এক বিবৃতিতে আমি বলি, অক্টোবরের শেষভাগে জল সরিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে

এই বিরাট ভূখণ্ডে যাহাতে যব গম কলাই উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বীজ-বণ্টনের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। স্থানীয় কৃষকেরা এই প্রকার সাহায্যের জন্য আমাদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট এই দিক হইতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ইহা একটিমাত্র দৃষ্টান্ত; প্রয়োজন হইলে আরও অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) এই পত্রে অন্যান্য সমস্যার বিশদ আলোচনা করিতে চাই না। শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করা, নিরাশ্রয়দের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা, হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর জেলায়—তাহাদিগের চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা, এইরূপ অনেক সমস্যা রহিয়াছে।

(১০) বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে; সেজন্য রাজনীতিক ব্যবস্থাও অপরিহার্য। আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি সাহস করিয়া সমস্ত রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি-দান করুন। এই সঙ্কটসময়ে দেশের সেবা করিবার জন্য তাঁহাদের প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে, মুক্ত হইলে তাঁহারা ইহার সুযোগ পাইবেন। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বলিতে পারি, যদি এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা হইলে বাংলার আর্থিক এবং রাজনীতিক অবস্থার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইবে। আমাদের এবং আরও অনেকের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ভারতবর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক হইতে স্বাধীন না হইলে আমাদের সমস্যাসমূহের স্থানীয় সমাধান হইবে না। আপনার স্বদেশীয় নরনারী যে ধারণা পোষণ করিয়া গর্ব অনুভব করেন, আমরাও ঠিক সেই ধারণা পোষণ করি—যে, প্রাচ্যেই হউক

আর পাশ্চাত্যেই হউক, বৈদেশিক প্রভুত্ব সহ্য করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। বর্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার বাস্তবতাকে আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না ; বাংলার অধিবাসীদের রক্ষা করিতেই হইবে। তাহারা যদি দারিদ্র্য ও অনশনে মরিয়া যায়, তাহা হইলে বাংলারও অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে।

(১১) কর্তব্য অতিশয় দুরূহ। গবর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ যদি সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া যায়, তবেই ইহার সমাধান হইতে পারে। আজ অকপট সদিচ্ছা লইয়া বিরোধের অবসান ঘটাইবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষে যে শাসন-ব্যবস্থা চলিতেছে, সর্বোত্তম শাসকও উহার চক্রজালে পড়িয়া যাইতে পারেন। আপনি কি ভাবে কার্য-পরিচালনা করিবেন, কি ভাবে কঠোর কর্তব্য-পালনের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা জানি না। কিন্তু এই কথা বলিয়া আমি শেষ করিতে চাই, বাংলার অধিবাসীদের যথার্থভাবে আহ্বান করিবার সাহস ও রাজনীতিক দূরদৃষ্টি যদি আপনার থাকে, তাহা হইলে সকলেই সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিয়া বর্তমান সঙ্কটের সমাধান-চেষ্টায় সমবেত হইবে।



# প্রতিকারের উপায়

সম্প্রতি বাংলায় যে দুর্দিন দেখা দিয়াছে, ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার ফলে স্বাভাবিক সময়েও ভারতবাসী দারিদ্র্য ও আংশিক অনশনের মধ্যে দিন যাপন করে। ইহার উপর আজ বাংলায় আরও বিষম সঙ্কট ঘনাইয়া আসিয়াছে—যুদ্ধের সংঘাত ও গুরুতর রাজনীতিক দুর্দৈব।

পঞ্চাশের মন্বন্তর দৈব দুর্ঘটনা-প্রসূত নয়। বন্যা ও বাত্যার ফলে কয়েকটি জেলায় শস্যহানি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সারা বাংলা জুড়িয়া যে নিদারুণ বীভৎসতা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ অন্যবিধ। নিন্দাবাদ বা দোষ দেখানো এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বৃটিশ-সরকার এখনও ভারতের প্রভুত্ব দাবি করেন; আমি চাই, তাঁহাদের উদ্যোগে একটি রয়্যাল-কমিশন গঠিত হউক। নিরপেক্ষ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ঐ কমিশনের সদস্য হইয়া দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ অনুসন্ধান করিবেন। তখন ধরা পড়িবে, আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কত গলদ, কত অনাচার ও অযোগ্যতা। বৃটিশ-সরকারের যে প্রতিনিধিদের হাতে আসল ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতাও তাহা হইলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বোঝা যাইবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের শূন্যগর্ভতা। একদিকে মন্ত্রি-মণ্ডলী—তাঁহাদের দায়িত্ব আছে প্রচুর, কিন্তু ক্ষমতা নাই। অপর দিকে লাটসাহেব ও আমলাচক্র—তাঁহারা সর্বশক্তিমান, কিন্তু দায়িত্বের কোন বালাই নাই। বাদ-প্রতিবাদ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ অনেকই

হইয়াছে। যদি সত্য নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানের ভার দিতে হইবে এমন সব সুযোগ্য ব্যক্তির উপর, যাঁহারা শ্রদ্ধার্হ, দেশবাসী যাঁহাদের উপর পূর্ণ আস্থাশীল।

বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছিলাম। তাহার ফলে ভারতের প্রতি অঞ্চলে ধারণাতীত সাড়া জাগিয়াছে। সর্ব-শ্রেণীর মানুষের নিকট হইতে স্বতঃ-উৎসারিত সাহায্য-ধারা আসিতেছে। বাঙালির হৃদয় ইহা গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু আমি বারম্বার বলিয়াছি, শুধু জনসাধারণের চেষ্টায় সঙ্কটের অবসান হইতে পারে না। গবর্নমেণ্টের সর্বপ্রধান কাজ, দেশাবাসীর খাদ্য যোগানো; এই কর্তব্য পালনে গবর্নমেন্টকে বাধ্য করিতে হইবে।

আমাদের চেষ্টার ফলে অন্তত দুইটি কাজ হইয়াছে। প্রথমত, বাংলা ও অপরাপর প্রদেশে, এমন কি ভারতের বাহিরেও—জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। খবর চাপা দেওয়া এবং অবস্থা লঘু করিয়া দেখানোর যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সত্য গোপন থাকে নাই। সমগ্র সভ্য-জগতের দৃষ্টি আজ বাংলার উপর পড়িয়াছে; ভারতে বৃটিশ-শাসনের ফলাফল লইয়া দেশ-বিদেশে তিক্ত সমালোচনা হইতেছে।

দ্বিতীয়ত, এ যাবত সরকারি-প্রচেষ্টা অতি সামান্যই হইতেছিল। শুধু এই বুলি শুনিয়া আসিতেছিলাম, ঘরে ঘরে অজস্র খাদ্যসম্ভার গোপনে সঞ্চিত হইয়া আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য-চেষ্টায় মন্ত্রিমণ্ডলীর এখন সুর বদলাইয়াছে। লোভী ব্যবসাদার ও সঞ্চয়ী গৃহস্থের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আর দায় মিটিবে না; সরকারের চোখ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেশবাসীকে বাঁচাইবার প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদেরই। গবর্নমেণ্টের তরফ হইতে আজ অবধি খুব যে বেশি কাজ হইয়াছে তাহা নয়। তবে লাভ এই হইয়াছে, সারা বিশ্বের কাছে কর্তৃপক্ষকে

অবিরত জবাবদিহি করিতে হইতেছে। জনগণকে শাসন করিবার যাঁহারা দাবি রাখেন, জনগণের জীবন-রক্ষার দায়িত্ব হইতে তাঁহারা কিছুতেই অব্যাহতি পাইবেন না।

বাংলার সমস্যা আজ বড় নিদারুণ। কেবল অন্নসত্র খুলিয়া ইহার সমাধান হইবে না। পল্লী-অঞ্চলে খাদ্য একেবারে অমিল। পেটের জ্বালায় ও দুর্দশার তাড়নায় মানুষ গ্রাম ছাড়িয়া দলে দলে শহরে আসিতেছে। আশা, শহরে আসিলে খাদ্য পাইবে। মৃত ও মুমূর্ষুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবনীশক্তির শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারেরাও আছেন। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে ইঁহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবেন।

মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। ছন্নছাড়া হইয়া কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতেছে, ঠিক নাই। গোষ্ঠিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রুগ্ন কঙ্কালসার শিশুগুলি বাংলার ভবিষ্যৎ শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যত দ্রুত সম্ভব সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে; স্থানীয় লোকজনের মধ্যেও তাহারা অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর অভাবে সকল চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। আবার খাদ্য যদিই বা কোনপ্রকারে সংগৃহীত হয়, যানবাহনের অসুবিধায় উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিশেষ কিছু কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দশজনকে লইয়া পরস্পরের সংযোগ-সূত্রে কাজ করিবার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। যে কোন মূল্যেই চাউল কিনিতে হইবে—এই বেপরোয়া

নীতির ফল আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট স্বল্পতা রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে সরবরাহ ও বণ্টন—উভয়েরই পূর্ণ ভার লইতে হইবে; ঐ দুইটি ব্যাপার এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে খাদ্যের অভাবে কোন শ্রেণীর লোককেই উপবাস করিতে না হয়। কিন্তু ইহার জন্য চাই, এমন গবর্নমেণ্ট—যাহার উপর দেশের সর্বশ্রেণীর আস্থা আছে। গবর্নমেণ্টের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থ অভিন্ন হইলে তবেই জাতীয় কল্যাণের এই নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার পরিকল্পনা আমি ইতিপূর্বেই গবর্নমেণ্ট ও দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিয়াছি। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে বাংলার মোট জন-সংখ্যার শতকরা সাত ভাগ মাত্র বাস করে। বাংলার গ্রামের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, উহা পাঁচ হাজার ইউনিয়ন-বোর্ডে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত মিউনিসি-প্যালিটির সংখ্যাও প্রায় এক হাজার হইবে। এই বিরাট পল্লী-অঞ্চল আজ একেবারে চাউলশূন্য হইয়া গিয়াছে; গ্রামবাসী তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করিতেছে। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে ঐ পাঁচ হাজার ইউনিয়ন বোর্ড ও এক হাজার মিউনিসিপ্যালিটি কেন্দ্রে অবিলম্বে চাউল আটা ও অপরাপর খাদ্যবস্তু পাঠাইতে হইবে। প্রতি কেন্দ্রে গড়ে অন্তত হাজার মন করিয়া পাঠাইয়া (কতকগুলি বড় শহরে বেশি পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে) গবর্নমেণ্ট অগৌণে কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। স্থানীয় সাহায্য এবং বাহির হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা অবিরত এই ব্যবস্থাকে পুষ্ট করিতে হইবে। প্রয়োজন মতো ক্রমশ আরও মাল-সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে। রাষ্ট্র ও জন-সাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রকার ব্যাপক সাহায্য অবিলম্বে

যদি আরম্ভ না করা হয়, তবে পৌষ মাসে আমন ফসল উঠিলে তাহাও দেশবাসীর ভোগে আসিবে না। উহার সংগ্রহ ও বণ্টনে অব্যবস্থা চলিবে; দুর্ভিক্ষ দেশের মধ্যে স্থায়ী হইয়া রহিবে।

প্রত্যেকটি কেন্দ্রে সরকারি গুদাম থাকিবে; একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মচারী উহার তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বা মিউনিসিপ্যালিটি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহচর্যে সাম্প্রদায়িকতা ও দলগত প্রশ্ন আদৌ আমলে না আনিয়া সাহায্য-ব্যবস্থা করিবেন। মানুষ আজ খাদ্যের প্রত্যাশায় ঘরবাড়ি ছাড়িতেছে, এই রকম ব্যবস্থায় তাহা নিবারিত হইতে পারে। দুর্গত গ্রামবাসীদের জন্য যে শস্যভাণ্ডার গঠিত হইবে, শস্যের পরিমাণ তাহাতে প্রয়োজনের অনুরূপ না হইলেও এইরূপ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের সামাজিক চেতনা জাগ্রত হইবে। ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার কাজে তাহারাই শেষে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে। দুর্ভিক্ষ বাংলার চিরাচরিত জীবন-রীতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে; মাত্র এই উপায়েই তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কলিকাতা ও অন্য কয়েকটি বড় শহরের জন্য শস্যভাণ্ডার সম্পূর্ণ পৃথক রীতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রামাঞ্চল অভুক্ত রাখিয়া শহর বাঁচাইয়া রাখা—ইহা যেন কখন ঘটিতে না পারে।

খাদ্যসংগ্রহ ও বণ্টন সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরকারি তরফ হইতে হয়তো দুইটি আপত্তি উঠিবে—প্রথম, মাল কোথায়? দ্বিতীয়, যানবাহনের উপায় কি? গবর্নমেণ্টের হাতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য সঞ্চিত আছে, জনসাধারণকে তাহা কখন জানানো হয় না। গত দুই মাস ধরিয়া বাংলায় প্রচুর মাল আমদানি হইতেছে, কিন্তু 'ততঃ কিম্'—এ তথ্য আমাদের নিকট একেবারে রহস্যাচ্ছন্ন। যে কোন উপায়ে হউক, খাদ্যশস্য চাই-ই। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে—

ভারতের বাহির হইতেও সরকার অবিলম্বে আমদানির ব্যবস্থা করুন। যুদ্ধের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে বহু প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ-ছয় মাসের উপযুক্ত খাদ্য মজুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রেল-কোম্পানি পোর্ট-ট্রাস্ট কলকারখানার মালিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের সহ-যোগিতা আহ্বান করা হউক, তাঁহারা মজুত খাদ্যের কতক অংশ সাময়িক ভাবে ধার দিয়া জাতির প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করুন। শস্য-ভাণ্ডার আবার পূর্ণ করা যাইবে, কিন্তু মানুষের প্রাণ গেলে আর ফিরিবে না। নূতন ফসল উঠিলেই এই ঋণ শোধ দেওয়া হইবে; ভারত-সরকার উহার দায়িত্ব লইবেন। গত আট মাস ধরিয়া আমরা বারম্বার বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে বলিয়াছি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার জন্য কে দায়ী, তাহা বিচার করা প্রয়োজন।

পত্র-পত্রিকার মারফত শুনানো হইয়া থাকে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ অজস্র খাদ্যসম্ভার মজুত করিয়া রাখিয়াছেন; সে সব দুর্ভাগ্য জাতি এখন অক্ষশক্তির অধীন, তাহারা মুক্তি লাভ করিলে ঐ খাদ্য দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান আমরা আজ বৃটিশ রাজত্বে বসবাস করিয়াও হাজারে হাজারে মারা যাইতেছি। ঐ সুবিপুল খাদ্যভাণ্ডারের কিছু অংশ কেন আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না?

ক্যানবারা হইতে রয়টারের টেলিগ্রামে (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) জানিতে পারি—

কৃষি ও বাণিজ্য-মন্ত্রী মিঃ উইলিয়ম জোন্‌স্ স্কালে বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাহাজ যোগাইতে পারেন, একক অষ্ট্রেলিয়াই দুর্গত ভারতের যত গম দরকার—সমস্ত সরবরাহ করিতে পারেন। চালান দিবার জন্য গম মজুত হইয়া আছে, এখন জাহাজ পাইলেই হয়। জাহাজ মিলিবে কিনা, যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে এ সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নাই।

অস্টে লিয়া মাল পাঠাইবার জন্য তৈয়ারি হইয়াই আছে। আনুমানিক আশি হইতে একশ মিলিয়ান বুশেল গম অষ্ট্রেলিয়ায় আছে; আবার কয়েক মাসের মধ্যে নূতন ফসল উঠিবে। অতএব ভারতেপাঠাইবার মতো প্রচুর গম রহিয়াছে।

মিঃ স্কালে কয়েক সপ্তাহ আগে একবার বলিয়াছেন, ভারতে পঞ্চাশ হাজার টন গম পাঠান হইয়াছে, জাহাজ পাইলে আরও পাঠান যাইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে প্রায় আড়াই কোটি মন গম অস্ট্রেলিয়ায় মজুত আছে। ভারতবর্ষে গম পাঠাইবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব, অথচ জাহাজের ব্যবস্থা হইতেছে না। বৃটিশ-গবর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই বাংলার এই সঙ্কটের অবসান ঘটাইতে পারেন। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হইবে।

আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে দ্বিতীয় আপত্তি উঠিতে পারে, যানবাহনের অভাব—পল্লীতে পল্লীতে খাদ্য পৌছানো হইবে কি উপায়ে? কিন্তু এই আপত্তি একেবারে ভিত্তিহীন। একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বুঝিলে যানবাহনের অভাব হইবে না। পনের দিনের জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হউক। সমস্ত সাধারণ কাজকর্ম বন্ধ রাখিয়া রেল স্টিমার নৌকা মোটরভ্যান সামরিক ও বেসামরিক লরি এমন কি গরুর গাড়ি পর্যন্ত খাদ্য বহিবার কাজে লাগিয়া যাক। বাংলার লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্টের জন্য শস্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলা—ইহার অধিক প্রয়োজনীয় কর্তব্য বর্তমান মুহূর্তে আর কি আছে? আজ যদি বাংলাদেশে শত্রুর আক্রমণ হইত, যানবাহনের অভাবে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিতাম? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জাপানি অভিযানের চেয়ে কোন অংশে কম সাংঘাতিক নয়। এই ব্যাপারটিকেও যুদ্ধ-সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে হইবে। বাংলা আজ প্রায় অন্তিম দশায় উপস্থিত হইয়াছে; এখনও যদি তাহাকে বাঁচাইবার অকপট আন্তরিক চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে শ্রেণী-

নির্বিশেষে জনসাধারণ সাহায্যদানে কার্পণ্য করিবে না। প্রয়োজন হইতেছে উদ্যম দূরদর্শিতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির।

প্রতিদিন—প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন পরম মূল্যবান। বাংলার বিভিন্ন অংশ হইতে দুঃখ দুর্গতি ও অভাবের অতিশয় শঙ্কাজনক বিবরণ পৌঁছিতেছে। এই নিদারুণ বিপদের দিনে জনহিত-প্রচেষ্টায় আমলা-চক্রের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের তুলনা নাই। আমাদের নামে দোষারোপ করা হয়, এই খাদ্যসঙ্কট ব্যাপারটিকে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছি। বাস্তবিক, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্যই তো ভারতবর্ষের এই অর্থনীতিক দুরবস্থা; এবং সেই কারণেই বাংলা আজ দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

খাদ্যকে আমরা কোনক্রমেই রাজনীতিক ক্রীড়াবস্তুতে পরিণত করিতে চাই না। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, এই দুর্ভিক্ষের মূল-কারণ শাসকবর্গের ত্রুটি ও নির্বুদ্ধিতা, তখন সে কথা ব্যক্ত করিয়া ভ্রান্তনীতি পরিবর্তনের দাবি করা কি ভারতীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে মহাপাতক হইয়াছে?

ইংরেজ এই অবস্থায় পড়িলে ইংল্যাণ্ডে আজ কি ঘটিত? অনাহার মহামারী ও মৃত্যুর তাড়নায় এমনি করিয়া যদি কাউন্টি হইতে কাউন্টিতে শহর হইতে শহরে দলে দলে নরনারী মরীয়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কঙ্কালসার নগ্নশিশুর আর্তনাদে লণ্ডনের রাজপথে যদি এমনি শ্মশানের ছায়া নামিত, হাইড-পার্ক হ্যাম্পস্টেড-হীথের উপর মলমূত্রে সিক্ত ভূমিশয্যায় শত শত শব পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে কি দশা হইত ডাউনিং স্ট্রীটের? ক্যাবিনেট কতক্ষণ টিকিত?

ভারতবর্ষের আজ কি অবস্থা? যুদ্ধ-ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানকে বাদ দিলে বাকি সমস্ত দেশবাসীর অবস্থা মর্মান্তিক

হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ; অথচ এই দুর্গতির প্রতিবাদে একটি অঙ্গুলি তুলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেশপ্রেমিক সহস্র সহস্র নরনারী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ। আর সকলের উপরে রহিয়াছে আমাদের অস্থিমজ্জাগত সনাতন অদৃষ্টবাদ—সকল দুঃখ-দুর্দশার জন্য আমরা দুরতিক্রম নিয়তিকে দায়ী করিয়া থাকি। মানুষই যে আমাদের জন্মগত অধিকার নিরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই নির্মম সত্য ভুলিয়া যাই। রাজনৈতিক অধীনতা, অর্থনৈতিক সঙ্কট, চিত্তের ক্লৈব্য, বুদ্ধির জড়ত্ব—সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষকে আজ নূতন সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৩